সমকালের গল্প

সম্পাদক

জ্যোৎস্নাময় বসু
কিরণচন্দ্র মৈত্র

পরিবেশক

লিপিকা

৩০/১-এ কলেজ রো, কলকাতা—৭০০০০৯

প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬২

প্রকাশক :
ডি. চক্রবর্তী,
৩০/১-এ কলেজ রো
কলকাতা—৭০০০০৯

মুদ্রক :
শরৎচন্দ্র প্রধান
মহাপ্রভু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১২, বিনোদ সাহা লেন।
কলকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
শ্রীপ্রভাস

'কৃশানু' পত্রিকার সম্পাদক

দীনেশচন্দ্র সিংহ

প্রিয়বরেষু,—

নিবেদন

দেশী-বিদেশী গল্প সংকলনের অভাব বাংলা সাহিত্যে নেই। নামী ও দামী লেখকদের গল্প-সমগ্র, গল্প-সংগ্রহ, রচনা-সমগ্র ইত্যাদি বইগুলির ভীড়ে সমকালীন বারোজন স্বল্প-পরিচিত লেখকের গল্প প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছি।

পাঠকদের বিচারে উন্নীত হলে এই সংকলন সার্থক মনে করব।

পরিশেষে লিপিকা-র কর্ণধার শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্তীর সাহসিকতার প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না।

সম্পাদকদ্বয়

গল্পক্রম

অন্য নায়ক   হরিপ্রসাদ ভৌমিক

গত বছর লিপি মা হবার পর থেকে সব বিলকুল ভুলে যাচ্ছে। বেমালুম অবহেলা করে চলেছে অবনীকে।

লিপি, চাঁদের আলো মেয়ে আমার! তোমার কণ্ঠে সপ্তস্বরের মূর্চ্ছনা। দেহে সপ্ত রঙের ছটা। হিজল বনের ছায়ার মতো তোমার চোখে কি যে মায়া!

"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।" আমাকে ক্ষমা করো, কবির কথাটি হুবহু নকল করলাম। কারণ, আমার রক্তে তোমার রোমন্থন চলবে হাজার বছর ধরে। 'সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে।' লিপি, তুমি আমার আত্মার অনুভব। ইন্দ্রিয়ের পরশমণি। তোমাকে প্রথম দেখলাম। নায়ক সেজে অভিনয় করলাম। আমি প্রজাপতির মতো পাখা মেললাম।

অবনীর চোখে আগুন জ্বলে উঠল। শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী যানে উঠে মনটা বিমানবাহী হ'ল।

দিন নেই রাত নেই। শুধু গতি আর গতি। এ পথ ফুরাবে না। এখানে গোধূলির ম্লান আলো রাখালের ছন্দহীন বাঁশির সুরে খেলা করে। দূর্বাঘাসের ওপর বাতাস আপন খেয়ালে ঢলে পড়ে।

মাতালের প্রলাপের মতো অর্থহীন অভিনয়। লিপিকা নৃত্য ক'রে চলে। সোনালী শামুকের মতো নারী দেহ লোভনীয় রকমের সৌন্দর্যে ঝলমল করছে।

—অবনী, এই অজ পাড়াগাঁ থেকে প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। অতএব তোমার কথামত আমি সহরে এলাম। যে মহাবিদ্যালয় আমাকে স্নাতক হবার গৌরব দিয়েছে এক বছর পরে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম অবাক চোখে। আমার কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলের এই সহর বড় রঙীন লাগল।

যে দিকে চাই—তারার আলো, দিনের আলো। আবার হঠাৎ মনে হ'ল নারীরও অন্ত নাম বুঝি আলো।

লিপিকা বলল,—আমি বড় হব।

—আমিও? অবনী তার ছেলেবেলায় ফিরে গেল।

সাধ্যমত লিপিকা অবনীকে সাহায্য ক'রে চলল। সখের থিয়েটারে দিন দিন লিপিকার চাহিদাও বেড়ে চলেছে। আরো বড় মালিকরা এসে লিপিকাকে ডাক দিয়ে যায়। সে অস্বীকার করে। অবনীর জন্ম পিছন ফিরে চায়। হয়তো পাখির মতো স্বাধীন জীবন ছেড়ে মালিকের ক্রীড়নক সাজতে বাধে।

লিপি, তুমি এক কণা ভোরের আলো। কত পবিত্র। কত স্নিগ্ধ। তোমার একমাথা চুল মাধবীলতার মতো রঙচঙে।

লিপিকার মাথা কোলে ক'রে অবনী তাকে আদর করে। আবদার করে বলে,—তোমার এই দেহ এই মন আমার ক'রে নেব। এক অভিন্ন পথের যাত্রী হব।

লিপি, আরেকটু সকালে ফের না ঘরে? তোমাকে দেখব। আরেকটু দেখব। দেখো, আমাদের এই এক ফালি ঘর তুমি এলে সুরভিত হ'য়ে ওঠে। ধূপ জ্বেলেও এই গন্ধটি ঠিক পাই না। তোমার চাঁপা ফুলের মতো কোমল হাত আমার হাতে রাখ।

অবনী একা নয়। লিপিকাও আদরে আটখানা হয়। অবনীর চওড়া বুকে মুখ রেখে রূপকথা বলে। বৃত্তের মতো কখন সে গল্প আবার স্বস্থানে ফিরে আসে। কে যেন নহবত বাজায়। রঙমশালে রাজপথ আলোকিত করে। এই সহরের কোলাহল ছেড়ে কোন এক নির্জন্ সমুদ্র দ্বীপের স্বপ্ন দেখে। সেই সোনা দ্বীপ উর্বরা করবার সাধ জাগে।

—না। লিপিকা ঘুরে আসতে চেষ্টা করে।

তোমার প্রস্তাব, তোমার সমস্যা মেনে নেবার জোর আমার ছিল। অতএব দরকার মত আমরা অপেক্ষা করব।

—অবুঝ হয়ো না লক্ষীটি। তোমার কষ্ট দেখে আমার দুঃখ হয়। তুমি চানস্ না পেলে আমারই বা কি দাম?

লিপি, আমরা একই গৌরবের অংশীদার, অথচ দেখো, তুমি যার চোখে

পড়েছ সে লোক পাকা জহরী। কাঁচা পাকার ব্যবধান বোঝে। অভিনয় একটা আর্ট। তুমি জাত আর্টিষ্ট। আমি তো জানি, তোমার দেহে 'অজন্তা ইলোরার শিল্পী মন ঘুরে বেড়াচ্ছে। পলিমাটি পড়লে এ ধরণী শ্রী সম্পদে ভরে উঠবে। লিপি, তোমার রূপের ক্ষয় নেই। একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা তোমাকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে। তুমি এগিয়ে চলেছ। মঞ্চ থেকে চিত্রে। আমি অভিমান করব কেন? তোমার হাত ধরে আরো এগিয়ে দেব।

লিপিকা সুনাম কিনবে। অবনীর কত সম্মান। লিপিকাকে বড় করে অবনী মহৎ হবে।

এজীবন রঙ্গমঞ্চ। আমরা কেউ নট কেউ নটী। আমরা অভিনয় করি প্রকাশ্যে। নেপথ্যে। অনেক অনেক অভিনয়। তিন ভুবনে আমাদের মন ছড়িয়ে আছে। এই মনের নাগাল ধরা বড় শক্ত। প্রায় অবিশ্বাস্য। তাই কল্পনা করি। স্বপ্ন দেখি।

জল চাই জল। চাতকের মতো গ্রীষ্মের খররৌদ্রে ডেকে ডেকে সারা হবার চেয়ে এস না আমরা সন্ধি করি। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী থাকল।— আমরা কোনদিন বন্দী হব না।

—লিপি, এস না আমরা দুদিন ঘর পাতানোর অভিনয় করি। পারবে তো?

—পারলেই বা। দোষ কি?

অতএব পয়সার জন্য অভিনয় সুরু হল। তুমি নায়িকা, আমি নায়ক। অবশেষে প্রতিশ্রুতি মতো তোমার পদোন্নতি। এবং আমার অবনমন। কি অপূর্ব দেখ—। লিপি, দিন দিন আমি নরকে নেমে যাচ্ছি, অন্ধকারের গহ্বরে। এখন মিষ্টার আর মিসেস দত্তের নামে কোন যুগ্ম—ডাক আসে না। লিপি, আমি পাথর হলাম নাকি?

একদিন স্টুডিও পাড়া থেকে ঘুরে ঘুরে এসে বললে,—অবন, নায়িকা হবার চানস্ এদেশে কটা মেয়ের ভাগ্যে ঘটে? সত্যিই লোকগুলো কত ভদ্র। জান, নিজেদের গাড়ীর তেল পুড়িয়ে বাসায় তুলে দিয়ে গেছে! একটা সংলাপ ভুল হলে বার বার সুযোগ দেয়। কতবার যে পরিশ্রম ক'রে শেখায়। যেন শেখাবার দায়টা তাদের বেশী। তোমাকে একদিন নিয়ে যাব, দেখবে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্বর্গ সেখানে। বিশ্বাস কর—তুমি পাশে থাকলে

কি যে উৎসাহ পেতাম। মাঝে মাঝে দু'একবার খাবরে যাই। তুমি কি বলো, অভিনয় বইতো নয়?

তারপর অবনী ও লিপিকা পাশাপাশি বসে রূপালী পর্দায় লিপিকার অভিনয় দেখেছে। এই নির্জীব ছবিটার দিকে কথামালার শিয়ালের কি লুব্ধ দৃষ্টি! মধ্যাহ্ন ভাস্করের মতো সবার চোখে শাণিত বহ্নি। যে কোন মুহূর্তে দগ্ধ ক'রে ফেলবার তির্যক অভিযান। অবনী ঘন হয়ে লিপিকার কাছে বসতে চেষ্টা করে। সকলে তখন হাততালি দিয়ে নবাগতাকে অভিনন্দন জানায়।

তিপু এ গল্পের সবটুকু শোনে নি। কথা ওঠালে বলে, হ্যাঁগো, আজকাল তুমি নেশাটেশা কর নাকি?—না না বাপু, বড় আজে বাজে বকছ কদিন থেকে।

তিপু এসব কথা বিশ্বাস করে না। গুরুত্বও দেয় না তেমন। তার লাউ কুমড়ো লতার মাচা ছাগলে খেলে চীৎকারে সে সারা বাড়ী মাথায় তোলে। অথচ এই অব্যক্ত ক্রন্দনের জ্বালায় অবনী সারারাত ছটফট করে।

—লিপি, আমায় আর কতদূর নিয়ে যাবে?

—ছিঃ, আমাকে এত ছোট তুমি ভাবতে পারলে? ভাবতে পারলে আমি এত নোংরা?

সে কণ্ঠ না শুনলে বিশ্বাস করা যাবে না নিজেকে এমন করে পরিষ্কার করবার জোর লিপিকার—। প্রতিবাদের কোন সুযোগ নেই। লিপিকা পাঁকাল মাছ—। দিনরাত কাদায় থেকেও সারা দেহে নির্ভেজাল ছবি আঁকছে।

পরম সোহাগে অবনী লিপিকার অধর স্পর্শ করতে চেষ্টা করে। খুঁজে দেখে জুঁই ফুলের ভিজে গন্ধ। ভুল হয়—। লিপিকাকে কিছু বললে মাথা ঝিমঝিম ক'রে ওঠে।

সুতরাং অবনী অভ্যাসবশে বিনয়ী হ'তে চেষ্টা করে।

—না না, তোমার নামেই ফ্ল্যাট বাড়ীটা ভাড়া নাও।

—বল কি। লোকে শুনলে কি বলবে?

—লোকেরা এসে এ বাড়ীর ভাড়া দিয়ে যাবে কিনা।

লিপিকা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে। যে হাসিতে সরোবরের ছায়া পড়ে। জল যেন আয়নার মতো স্বচ্ছ।

ব্যালে নাচ শেখবার জন্য কতৃপক্ষ তোমাকে পশ্চিমে পাঠাবে। কয়দিন প্যারিসের গল্প তোমার মুখে মুখে ফিরতো।

—দেখ, একটা জাতি বটে। ফলের ব্যবসা করে বিশ্ব জয় করছে। অর্ধেক আপেলের মতো তোমার রঙীন ঠোঁট ভেজা—পিচ্ছিল। সেই লিপস্টিক রঙীন মুখে লেমনেড আর জিঞ্জারের গন্ধ। লিপি, তুমি চলে গেলে!

অবনীর জন্মদিনে এই ডাইরিটা সে উপহার পেয়েছে। পরিচ্ছন্ন পাতার ওপর দামী কলমের আঁচড়-কাটা ক'টি কবিতা।—শেষ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লেখা—'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

কাঁটাগাছের ঝোপ। পাট মেস্তা পচার দুর্গন্ধ। সাপ ব্যাঙের বড়বড় গর্ত। জলে ভাসা কালো পোকার তাণ্ডব নৃত্য। দামোদরের জল ছাড়বে। আসন্ন বন্যার পূর্বাভাস। রেললাইন ডুববে। গাছে গাছে মাচা ফেলতে হবে। হাটফেরৎ কতগুলো লোক ঈশ্বরের মুণ্ডপাত করছে। গরু মোষের খাদ্যের অভাব। কচুরীর দাম জলে ভেসে চলেছে। আকাশে মেঘ। একটু পরেই জল নামবে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাক। পুলের তলায় তীব্রস্রোত। কালো জল।

অবনী সোজা চলল। মেলট্রেনটা একটু পরেই ঝড়ের মতো এখান দিয়ে চলে যাবে। অনেক দূরে স্টেশন। পারতপক্ষে এসব জায়গায় ট্রেন সিটি বজায় না। হুস করে ইঞ্জিনটা বাঁক পেরিয়ে যায়।—তারপর একটা ক্ষতবিক্ষত মনুষ্য দেহের ভগ্নাংশ পড়ে থাকবে। এসব ভাবলে গা ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকে। কালো আলখাল্লা পরে কে যেন এগিয়ে আসছে। অদূরে একটা বিকট শব্দ হ'ল। ছাতনার চাতালে সেই বিখ্যাত শ্মশান অথচ লোকটা আরো এগিয়ে আসছে। একটা রঙীন আলো। আজ শনিবার। এই দিনে বারবেলা হয় নাকি? মাথা টনটন করছে। চামড়ার ওপর কে যেন হিমশীতল বরফ বুলাচ্ছে।—অবনী এই প্রথম মৃত্যুভয়ে ভীত হ'ল।

কিন্তু কোন্ ফাঁকে ট্রেনটা মুখে আলো জেলে চলে গেল। রাত বারোটার পরে ট্রেন নেই। সে হাঁটছিল। হাঁটতে লাগল জোরে জোরে।

কাঠবিড়ালীর মতো একদল উপজাতি মেয়ের কিচির-মিচির শোনা যাচ্ছে। রাস্তার ধারে আকন্দ গাছের পাতার ওপর সে হাত বুলাল।

হাত-পা'র শিরা দড়ির মতো জেগে উঠেছে। রেলের তলায় শাল—কাঠ গুণল সে।

সে ম্যানিব্যাগ খুলল। কাউন্টারে হাত বাড়িয়ে চেঞ্জ গুণে জামার পকেটে রাখল। টিমটিম করা আলোর নীচে অবনী বসল। তখন বাইরে ঝুপঝাপ করে জল নেমেছে।

এত রাত, মা ভূত দেখে চমকে উঠলেন। মার পরনে সাদা থানের কাপড়। হাতে কেরোসিনের বাতিটা টিমটিম করছে।

একটানা বর্ষণ থামিয়ে মা বললেন,—জানিস খোকা, বড় ভাল মরণরে। সবাই আমরা নাম শোনাচ্ছি। ভটচার্যী মশাই গীতার মাহাত্ম্য শোনাচ্ছিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে মরণ। আহা, কতবার তোর কথা বলেছিলেন। হ্যাঁরে এতদিন কোথায় ছিলি অবু!

—মা, মরে গিয়েছিলাম।

—একথা বলতে নেই বাবা।

মা ছেলের অধর ধরে আদর করলেন। আহা, মায়ের স্পর্শে মৃত্যুর পিচ্ছিলতা নেই। হোক না এই স্পর্শ শুকনো পাতার মতো খরখরে।

সেই আমার নরকের কাহিনী তিপুকে বলিনি। এখন তিপু এই সংসারের গিন্নী। মা মরে যাবার পর থেকে তিপুর সংসার-বুদ্ধি ফোয়ারার মতো ফুটে বের হচ্ছে। ছোট ভাই বোনদের তিপু জননীর মতো আদর করে। নিজহাতে সব কিছু গুছিয়ে দেয়। দরকার মতো শাসন করে। তিপু বড় পিতলের কলসীতে কল থেকে জল আনে। ভিজে আঁচলে মুখ মুছলে তিপুর মুখ করুণ দেখায়।

সুধা দিদিমণি এসে আমার বিরুদ্ধে স্কুল কমিটির অভিযোগগুলো তিপুকে মাঝে মাঝে শুনিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অঙ্কের নড়ি—এই মাষ্টারটা গেলে চলবে কেন? ছাত্রদের কাছে আমার অন্তঃসারশূন্য কথাগুলা নাকি বড় অশ্লীল।

মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে সুধা দিদিমণি স্কুল কমিটির মেম্বারও বটে। প্রতিমাসে মোড়ক করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আসে তার কাছে। বলা বাহুল্য এর বেশীর ভাগই সিনেমা পত্রিকা। কুমারী মহিলার সময় কাটাবার অফুরন্ত খোরাকে বোঝাই করা থাকে।

কিন্তু অবনীর কাহিনী সেখানে নেই। লিপিকার জীবনে অবনী রামধনুর মতো হঠাৎ উঠে নিঃশব্দে কখন আকাশে মিলিয়ে গেছে। —লিপিকার স্বামী ভারত বিখ্যাত ব্যবসায়ী কোন এক হুইলার না বাটলার। ভদ্রলোক চালাক, তাই বিয়ের আগে কনট্রাকটে সই করে নিয়েছেন—লিপিকা আর সিনেমায় নামতে পারবে না।

সুধা দিদিমণি তার সুঠাম দেহের ঝংকার তুলে বলল, 'অবনীবাবু, ভারতের চিত্রাকাশ হ'তে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল।'

অবনী ঝোঁকের বশে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল,—'নক্ষত্র কোনদিন খসে না, উল্কাই খসে।'

'এত বড় প্রতিভাকে—আপনি উল্কা বললেন কোন্ সাহসে?' থাকেন তো মশাই পাণ্ডববর্জিত গাঁয়ে—বুঝবেন কি এসব বহুমুখী শিল্পীর মর্যাদা?

—লিপিকা মানুষের মর্যাদা জানে না।

—মানে?

—কিছু না।

কখনো না। সুধা দিদিমণিকে এ কাহিনী অবনী কোনদিন বলবে না। অবনী বলেনি। এবং সুধা দিদিমণিও মেয়েমানুষ বইতো নয়, একই অ্যামিবার ভিন্ন ভিন্ন চুম্বক সংস্করণ।

তিপুর মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবনী সংসারের বোঝা বাড়িয়ে চলে। অথচ অবনীর নগ্ন ক্ষতটা তিপু কোনদিন বিশ্বাস করল না। নির্জন রাতে হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠে নিজেই অবনীর মুখে হাত চাপা দেয়। তিপুর বড় ভয়—ছেলে মেয়েগুলো দিন দিন বড় হচ্ছে।

অবনী নির্বাক হয়ে বসে কখনো মাথা ঝিম ঝিম করে। জ্বরে বিকারগ্রস্ত রোগীদের মতো স্মৃতি—অসঙ্গত প্রলাপ বকে চলে। অবনীর কিছু ভালো লাগে না। হেডলাইনে বড় বড় ক'রে লেখা সংবাদ পড়ে—চাল নাই গম নাই মাছ নাই তেল নাই।

নকল রাজা

সমরেশ মজুমদার

পুলের ওপর থেকে একটু ঝুঁকে পড়ে দোয়েল দেখল সুজন টপাটপ এক একটা পাথরে পা রেখে ঠিক ঝরণার মধ্যিখানে এগিয়ে যাচ্ছে। ঝরণায় নামবার আগে অবশ্যি সুজন ওকে অনেকবার বলেছে 'চল, কোন ভয় নেই। দেখব কি দারুণ দারুণ লাল চিঙড়ীর বাসা এখানে! কিন্তু দোয়েলের ঠিক সাহস হয় নি। পাহাড়ী ঝরণা, যা স্রোত।

দোয়েলের এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছিল। কি নিরিবিলি। ঝরণাটার নাম লেখা রয়েছে পুলের একপাশে মেছুয়াঝোড়া। আর এই ঝরণার গা ঘেঁষে খুঁটিমারীর জঙ্গল শুরু। গয়েরকাটা থেকে আসা এই সরু পীচের পথটা মেছুয়াঝোড়াকে ডিঙিয়ে দুপাশে খুঁটিমারীর ঘন জঙ্গলকে রেখে কুমারী মেয়ের পরিষ্কার সিঁথির মত চলে গেছে নাথুয়ার হাটের দিকে। এ ধারে মানুষজন নেই কোথাও। দোয়েল দেখল একটা বড় বানরের পেছন পেছন দু তিনটে ক্ষুদে বানর লাফিয়ে লাফিয়ে রাস্তা পার হল কিছু দূরে। ওপাশে চা বাগানের মধ্যে গরুর গলায় টুং-টাং করে ঘণ্টা বাজছে। দোয়েল তাকিয়ে দেখল জঙ্গলের মুখে বিরাট একটা কাঠের সাইনবোর্ড, তাতে বাঘ ভল্লুক সাপ আর হাতির ছবি আঁকা। একটা নীলচে পাখী সেই সাইনবোর্ডের ওপর বসে গলা ফুলিয়ে ডাকল, ট্যাঁ-ও-ও।

সুজন আবার ডাকল, 'এই নেমে এসো না, কি ভীতু মেয়ে রে বাবা।' —'শাড়িতে জল লাগলে তোমার মা কি ভাববে বলতো।' পুলের ওপর থেকে করুণ গলায় বলল দোয়েল।

সুজন আর কোন কথা বলল না। ও দেখছিল পরিষ্কার জলের তলায় রুপোর মতো চকচকে বালির ওপর ক্ষুদে মাছ খেলছে। দুটো পাথর ঠোকরা মাছকে দেখতে পেল। ওঃ, কতদিন পাথর ঠোকরা মাছ খাওয়া হয় নি।

কোলকাতায় এসব ভাবাই যায় না। কেমন ঝিম্ হয়ে আছে চারপাশ। একটানা একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডেকে চলেছে ঝরণার গা ঘেঁষা বেতঝাড়ে। প্যান্টটা হাঁটু অবধি গুটিয়ে নিয়ে পুলের ওপর থেকে ঝুঁকে দাড়ানো দোয়েলের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল ও। দোয়েল ভ্রূ কুঁচকে যেন জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার।' সুজন জলে নামল। হাঁটু জল। কিন্তু স্রোত খুব। বেশ কন্‌কনে। একটু পা হড়কাতেই সুজন নিজেকে সামলে নিল। কতকাল অভ্যেস নেই। পা টিপে টিপে ও সেই শ্যাওলাপড়া বড় পাথরের চাঁইটার কাছে এসে দাঁড়াল। এদিকে ততক্ষণে ওপাড়ের গাছগুলোতে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে, ঝরণার ওপরে ঝুঁকে পড়া একটা গাছের ডালে তিন চারটে বাঁদর চীৎকার জুড়ে দিয়েছে সুজনকে দেখে। আগে কিন্তু ওরা এরকম করতো না। এই শ্যাওলা পড়া পাথরটার গা থেকে ওরা লাল চিংড়ী ধরতে আসতো। সুজন খোকন আর নিতাই। আঃ কি দারুণ সেই দিনগুলো। সুজন পাথরটার খাঁজে হাত বাড়াল। মুখের ভাব দেখলে কে বলবে এই লোকটা ম্যাকফারসন এণ্ড মার্টিন কোম্পানীর দেড় হাজারী মনসবদার।

সুজন হাতড়ে হাতড়ে কিছুই পেল না। আশ্চর্য, এখানে কি আর চিংড়ীগুলো থাকে না। পাথরের আর একটা কোণে হাত রাখতেই কি একটা নড়ে উঠল। খপ্ করে ওটাকে ধরে ওপারে তুলতে গিয়ে সুজন আর্তনাদ করে উঠল আচম্‌কা। তার সামলাতে গিয়ে কিছুটা জল ছিটকে এসে ওর জামা ভেজাল। দোয়েল চমকে গিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?' পুলের পাশে সাজানো বোল্ডারে পা রেখে সর সর করে নেমে এলো কিছুটা। ততক্ষণে হাতের বস্তুটাকে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আঙুল চেপে ধরেছে সুজন। দোয়েল দেখতে পেল একটা বেশ বড় সবুজ ছিটে দেওয়া কাঁকড়া থপাস করে এসে পড়ল পাথরের ওপরে। এখনও একটা দাড়ার মুখ হাঁ। অন্যটা ভেঙ্গে গেছে। আঙুলটা ধরে সুজন ওপরে উঠে এল। তারপর কাঁকড়াটার দিকে একবার তাকিয়ে একটু লজ্জা পেল যেন, 'বাপ, জোর কামড়ে ধরেছিল।' দোয়েল খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। সুজনের গা ঘেঁষে আঙুলটা দেখবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'লাগেনি তো?'

'আরে দূর, এসব আমার কাছে নতুন নাকি! এখানকার নাড়ী নক্ষত্র আমি জানি, কাঁকড়ারা এরকমই হয়।' যদিও একটু একটু রক্তও বেরুচ্ছিল

আঙুল থেকে কিন্তু সুজন স্রেফ চেপে গেল। কি বেইজ্জতি ব্যাপার। এখানে ওর ছেলেবেলা কেটেছে এখানকার কত গল্প ও কোলকাতায় গিয়ে দোয়েলকে বলেছে আর একটা সবুজে কাঁকড়ার জন্যে—, সুজন হাসল।

ওরা পীচের রাস্তাটা দিয়ে হাঁটছিল। দুপাশে সবুজ গালচের মত চায়ের বাগান। কচিপাতা এখনও মুখ খোলে নি। একটা ধূলোর পাতলা সর পাতায় পাতায় জড়ানো। বৃষ্টি এলেই গাছগুলোর চেহারা অন্যরকম হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে শেডট্রীর ফাঁক দিয়ে রোদ নক্সা কাটছে পাতায় পাতায়। সুজনের ভীষণ ভালো লাগছিল। ও আর দোয়েল হাত টান টান করে ধরে হাঁটছিল।

'জানো, এখানে এলে, এই চা বাগান, জঙ্গল, এসবের কাছে এলেই আমি ছেলেবেলার গন্ধ পাই। ঐ যে বিরাট গাছের গুঁড়িটা দেখছ, ওখানে একটা বিরাট পাইথন বাসা করেছিল। বাগানের সাহেব সেটাকে মেরে ট্রাক্টরের পেছনে বেঁধে ঘুরিয়েছিল।' দোয়েল গুঁড়িটাকে দেখল। একটা সুন্দর কাঠবিড়ালী ঘাড় কাৎ করে ওদের দেখছে গুঁড়িটার ওপর বসে। বেশ মজার ব্যাপার।

এখন ঠিক বিকেল নয়। ওরা দুপুর থাকতে বেড়িয়েছিল। সুজনের বোনকে সঙ্গে আনতে চেয়েছিল দোয়েল। রোদ্দুরের দোহাই দিয়ে আসেনি সে। সুজনের মা আপত্তি করেন নি তেমন। কিন্তু ঘুরিয়ে বলেছেন, এখানে মেয়েদের স্বামীর সঙ্গে এভাবে বেরোনোটা ঠিক রেওয়াজ নয়।

'এটাকে ঠিক গ্রাম বলা যায় না, তুমি বল?' সুজন রাস্তার এক পাশে সরে একটা চা পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল।

'মফস্বল। আমাকে দাও তো পাতাটা।' দোয়েল হাত বাড়াল।

'একে ঠিক মফস্বলও বলা যায় না। এটা যে কি তা তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।'

'এই, এই পাতাটা শুকোলে চা হবে?' নাকের কাছে পাতাটা তুলে ঘ্রাণ নিল দোয়েল।

'এই তোমার বিদ্যে!' হো হো করে হাসল সুজন, 'অনেক প্রসেস আছে। শ্বশুরমশাইকে ধরো, উনি ফ্যাক্টরীটা দেখিয়ে দেবেন।'

রাস্তার দুপাশে দেওদার পাইন গাছগুলোর ছায়া এবার লম্বা হচ্ছে। ওরা একটা কুলি লাইনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। একদল মদেশিয়া ছেলেমেয়ে খেলছিল

একপাশে। ওদের দেখে হাঁ করে বড় বড় চোখে চেয়ে রইল, সুজন নীচু গলায় বলল, 'এই, তোমাকে দেখছে! দোয়েল ভ্রূ তুললে, 'দেখার কি আছে, আমি হাতি না ঘোড়া।'

'আহা দেখুক না। ওরা খুব ভাল বুঝলে দারুণ অনেষ্ট।' বলতে বলতে সুজন হঠাৎ একটু এগিয়ে দুটো বাচ্চার সঙ্গে কি কথা বলল। দোয়েল জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাষায় কথা কইলে? হিন্দি তো নয়।'

'মদেশিয়া।' সুজন হাসল, 'আরে আমি যে এখানকার ছেলে।'

একটা লোক আসছিল সাইকেল চেপে। ওদের দেখে নেমে দাঁড়াল। হাফপ্যান্ট আর খাকি হাফ সার্ট পরা। হাতে একটা ছোট লাঠি। গায়ের রঙ এবং কথা শুনে দোয়েল বুঝল এও মদেশিয়া হবে। দোয়েল শুনল লোকটা তুই তুই করে সুজনের সঙ্গে কথা বলছে। সুজন খুব লম্বা হয়েছে একদম আসে না কেন, পরবে টরবে আসতে তো পারে? বৌ বেশ সুন্দর হয়েছে—এসব কথা বলে লোকটা সাইকেলে উঠল। সুজন এমন কাচু মাচু হয়ে দাঁড়িয়েছিল—কোলকাতায় এ দৃশ্য ভাবাই যায় না।

'লোকটা কে গো?' দোয়েল হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল।

'একজন কুলি সর্দার। আমাকে খুব ভালবাসে। ওর সাইকেলের রডে আমি কত চড়েছি।' সুজন যেন খুব তৃপ্ত।

'মদেশিয়া?' দোয়েল আড়চোখে সুজনকে দেখল।

'হ্যাঁ। ব্যাকে যা খেলতো না—দারুণ সট।'

ওরা ডুংডুঙ্গির পুল পেরিয়ে লোকালয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এপাশে ওপাশে কাঠের থাক সাজানো। মাঝে মাঝে দুএকটা শ-মিল।

'এই মাথায় ঘোমটা তোল, শিগ্‌গীর।' সুজন চাপা গলায় বলল। চমকে উঠে আঁচল টানতে টানতে দোয়েল বলল, 'কেন?'

'কানাই কাকার কাঠের গোলা সামনে। বাবার কাছে রিপোর্ট হয়ে যাবে ঘোমটা না থাকলে।'

দোয়েল বেশ অবাক হল, 'বাব্বা, এত ভয়।'

'আরে এটা কোলকাতা নয়, বুঝছ না কেন। এখানকার কোন মেয়ে আজ অবধি চায়ের দোকানে ঢোকেনি, জানো?'

'আমরা এই পথটা দিয়ে যাইনি না?' দোয়েল একটা স্কুল বাড়ি দেখতে পেল সামনেই চণ্ডীমণ্ডপ।

'না। ঐ কুলীলাইন ঘুরে গিয়েছিলাম। দুদিকটাই দেখা হয়ে তোমার কেমন লাগছে?'

'ভালই তো,'

'ভালই তো। ঐ তোমাদের স্বভাব। মন খুলে ভাল বলতে পার না। এই যে স্কুলটা দেখছ, এখানে আমি ক্লাশ ওয়ানে পড়তাম। তখন এটা এত মডার্ন হয়নি। ভবানী মাষ্টার নামে একজন মাষ্টার ছিল। কি রাগী মুখ, এখনও মনে আছে আমার।' কেমন উদাস হয়ে কথাগুলো বলল সুজন।

এখন বিকেল। কেমন ঠাণ্ডা ছায়া নেমেছে চায়ের বাগানে। এক ঝাঁক টিয়া উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। দোয়েল একসঙ্গে এত টিয়া ছাখেনি কখনও। দূরে ফ্যাক্টরীর ছাদ দেখা যাচ্ছে। দোয়েলের নজরে পড়ল সামনে ঘাসের ওপর মার্বেলের চেয়ে বড় কয়েকটা ফল পড়ে রয়েছে। চার-পাঁচ রকমের রঙ। গাটা তেলতেলে।

'কি ফল গো!' দোয়েল একটা কুড়িয়ে নিল।

'দেখি!' সুজন ঝুঁকে পড়ে দেখল।

'কি শক্ত গা, রেলের মতন না? দোয়েল টিপে টিপে দেখছিল, 'খায়?' সুজন ঠোঁট টিপে হাসল। তারপর দোয়েলের হাতের চেটো সোজা করে দিয়ে গোল বলটাকে ঠিক মধ্যিখানে রেখে বলল, 'একদম নড়বে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক।'

'কেন?' দোয়েল ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না।

'আরে-যা বলছি কর না।'

দোয়েল ষ্টাচুর মত হাতটা সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকল খানিক। যেন কিছু ম্যাজিক দেখাচ্ছে এমন ভঙ্গীতে সুজন হাত তুললো। একটু বাদে হঠাৎ দোয়েলের মনে হল হাতের মধ্যে ওটা বুঝি নড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে সুজন হাঁক দিল, 'চিচিংফাঁক।' আর বলটা খুলে গিয়ে একটা কুৎসিৎ চেহারার পোকা হয়ে হাতের ওপর হাঁটতে লাগল। ভীষণ একটা চীৎকার করে দোয়েল হাত ঝাড়া দিতেই পোকাটা আবার বল হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

'ইস, ছিছি, তুমি বলনি কেন এটা একটা পোকা।' দোয়েল ঘেন্নায় কাঠ।

'একটু মজা করলাম! আমরা এই বল পোকা নিয়ে ছেলেবেলায় কত খেলতাম।' সুজন পোকাটাকে তুলে ক্রিকেট বলের মত থো করল।

কেমন একটা মিঠে গন্ধ বেরিয়েছে চায়ের গাছ থেকে। আকাশে অজস্র গম্ভীর রঙ মাখামাখি হয়ে রয়েছে। ওরা দেখল একটা মদেশিয়া ছেলে একরাশ ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে আসছে চা বাগান থেকে। প্রত্যেকের গলায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দ একসঙ্গে একটা অদ্ভুত বাজনা সৃষ্টি করেছে। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

ছাগলের পাল থেকে মুক্তি পেয়ে ওরা এবার বাড়ীর কাছাকাছি চলে এল দুপাশে দেওদার পাইনের সারি তার ফাঁক দিয়ে কোয়ার্টারগুলো উঁকি দিচ্ছে। দোয়েল মাথায় ভাল করে আঁচল টানতে গিয়ে দেখল কুলী লাইনের রাস্তা দিয়ে একটা লোক টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। ও চাপা গলায় বলল, 'এই ভাখো, লোকটা নিশ্চয়ই মদ খেয়েছে।'

'মদ পাবে কোথায়, হাড়িয়া টেনেছে। দিনরাত এদের ঠিক থাকে না।'

'আমার ভয় করছে।' সুজনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল দোয়েল।

সুজন এবার লোকটাকে ভাল করে দেখে হেসে ফেলল।

'হাসছ কেন?'

'ও মাতাল নয়, অন্ধ।'

'অন্ধ?' দোয়েলের সন্দেহ তবু?

'হ্যাগো। ওকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। সেই কুলী লাইন থেকে এমনি টলতে টলতে পা মেপে মেপে ও এই রাস্তা ধরে সোজা চৌমাথায় যাবে। সেখানে হরিপদকাকার চায়ের দোকানে এক ভাঁড় চা বিনা পয়সায় খেয়ে আবার অন্ধকারে ফিরে যাবে কুলী লাইনে। এই রাস্তার প্রতিটি পাথরকে ওর পা চেনে।'

লোকটা কাছে এসে পড়েছে। দোয়েল দেখল লোকটার পরনে কালো একটা হাফ প্যান্ট, তাতে তিন চার রকমের তালি। খালি গা, চুলগুলো উস্কোখুস্কো। হাঁ করে হাঁটছে। বোধহয় নাক টেনে বাতাস নিচ্ছে।

সুজন বলল, 'একটা মজার ব্যাপার কি জানো? ও আমার নাম জানে।'

'নাম জানে মানে?'

'মানে, আমি যদি ওকে বলি, এই আমার নাম কি বলতো; ও ঠিক বলে দেবে। কি করে যে মনে রাখে আমার গলা। এই যে আমি একবছর ছু-বছর এখানে আসি না, এলেও ওর সঙ্গে কথা বলি কি বলি না অথচ আমার গলা শুনে ও ঠিকঠাক বলে দেবে আমি কে ? বুঝলে !'

দোয়েল হাসলো, 'এ কখনো হয় !'

'হয়, হয়। এ তোমার কোলকাতা নয়। তুমি ভাবছ পারবে না ?' সুজন হাসল।

'পারলে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে বুঝব।' বলে খিল খিল করে হাসল। এতক্ষণে লোকটা দোয়েলের গলার শব্দ শুনল। ওকে একটু বিব্রত দেখাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সুজন জিজ্ঞাসা করল, 'এই বলতো আমার নাম কি ?'

সুজন খুব ব্যগ্র হয়ে চেয়েছিল। লোকটার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। ও খুব চেষ্টা করছে কিছু একটা মনে করতে, এটা বোঝা গেল। ওর চোখমুখ ক্রমশ কুঁচকে গেল। হাঁ করে দুবার নিঃশ্বাস নিল।

'কি বলছে না কেন ?' দোয়েল আবার হাসল।

লোকটা একটু একটু করে কেমন থিতিয়ে গেল। ভীষণ একটা কষ্ট ওর চোখেমুখে চাপ দিচ্ছে সুজন বুঝতে পারল। প্রাণপণে চাইছিল ও বলুক। প্রত্যেকবারে মত এবারও হেসে বলে ফেলুক নামটা। কিন্তু লোকটা ক্রমশ মাথা নামিয়ে ফেলল বুকের কাছে। থপথপ করে হাঁটল কয়েক পা। হাঁ করে নাক তুলে একবার নিঃশ্বাস নিয়ে লোকটা আবার চলতে শুরু করল মাথা নামিয়ে।

'পারলে না তো, বলতে পারলে না, কেমন জব্দ।' ম্যাজিকওয়ালার সব জারিজুরি ফাঁস করে দিয়েছে দোয়েল, 'আসলে এরা তোমাকে ভুলে গেছে, বুঝলে রাজা।'

সুজন কোন কথা বলতে পারছিল না। ওর একবার ইচ্ছে হ'ল ছুটে গিয়ে কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকায়, গলাটা টিপে ধরে বলে, বল শালা, বল আমার নাম জানিস না, ন্যাকামো। ফি বছর বলিস তাহলে কেমন করে। কিন্তু এসব কিছুই ও করল না। ওর বুকের ভিতরটা কেমন যেন ফাঁকা লাগছিল। ও ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধ লোকটাকে একবার দেখল। তারপর হঠাৎ সন্ধের আকাশ, চা বাগানের জঙ্গলের ঘন ছায়ায় চোখ রাখল। কেন এমন হয়। ওর হঠাৎ মনে পড়ল ঠাকুরমার শেষ অসুখের দিন ব্রজেন ডাক্তার যখন ঠাকুরমার বন্ধ ঘর

খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তখন বাবা কাকা ওকে ঘিরে উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়েছিল। কেউ কোন প্রশ্ন না করলেও ব্রজেন ডাক্তারের মুখে কিছু একটা শুনতে চেয়েছিল। ব্রজেন ডাক্তার ফ্যাল-ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন, তার ঠোঁট নড়েছিল। কিন্তু কিছুই না বলে থপ করে মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গিয়েছিলেন ব্রজেন ডাক্তার ঠিক এই লোকটার মত। হঠাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় সুজন স্পষ্ট চোখে তাকাল দোয়েলের মুখের দিকে। সেই পরিতৃপ্ত সুখী মুখের পাশ দিয়ে, ক্রমশ: দূরে চলে যাওয়া অন্ধ লোকটাকে সুজন দেখতে পেল। সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুজনের মনে হল ব্রজেন ডাক্তার চলে যাচ্ছে।

চরণ চরিত — অশোককুমার সেনগুপ্ত

কাছিমের পিঠের মত রুক্ষ বৃক্ষহীন ভুঁইটা আচমকা ঢালু হয়ে একটা ফালি রেখে ক্ষেতে মিশেছে। কাছিমের মুখ বলে অনায়াসে অনুমান করা চলে অনতিপ্রশস্ত ফালিটায় চরণদাসকে থমকে পড়তে হল। আলপথে হেঁটে আসছে তিনজন। ভ্রূ'র উপরে হাতের পাতা উপুড় করা নৌকার মত করে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করতে করতে মনে হল মাঝেরজন রতন!

রতন দু'দিন ঘর ছাড়া। দিনভর ছেলেটা ঘরে থাকতনা। তবু বাপবেটার সংসারে ওর অনুপস্থিতিতে কি খাঁ খাঁ শূন্যতা। তিন তিনটে দিন কেটে গেল কোথায় যে বাপধন! পাশের ডোবা ঘেঁষা বাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে কেবলই কেঁক কোঁক শব্দ, শুকনো ঝোপেঝাড়ে মুরমুর, বাগদীপাড়ার দিকে ঘরের কোল ঘেঁষে শীর্ণ রাস্তায় মানুষের ছায়া কি গলার শব্দ সবেই চমক—এই বুঝি রতন আসে গ! বিনিদ্ররাতে ছেঁড়া চাটাইয়ে এপাশ ওপাশ, রাতচোরা পাখির ডানার ঝাপটানি, শিয়ালের হাঁক, পাড়ার কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ—এই বুঝি রতন আসে গ! কে কাকে ডাকে হাঁক পেড়ে তরঙ্গে তরঙ্গে ছোটে স্বর, দীর্ঘতর হয়ে প্রত্যুত্তর ছুটে আসে, বুকে বাজে সেই শব্দ—এই বুঝি রতন আসে গ।

কিন্তু কোথায় রতন! না বলে ধন যে কোথায় গেল! সকাল থেকেই মনে মনে জিজ্ঞাসা, রতনকে দেখেছ আমার? অ বলাই, তুমি ত তাঁতিপাড়ার হাটে গেইছিলে, রতনকে দেখেছ? অ গোবিন্দ তুর সাথে ভাব ছিল আমার রতনের তুকে বলে যায় নাই কুথা গেইছে? অ পিয়ন দাদা রতনকে দেখেছ! আমার রতন গো; কালো রুগা ঢ্যাঙা পারা বটেক, কচি কচি মুখ, লুমের পারা দাড়ি গুঁফ, লাল ডুরা জামা পড়ে আছেক। কালু তু কাল সিউড়ী গেইছিলি, রতনকে দেখিস নাই?

না না। এক উত্তর সঙ্গে কারও বা যোগ—ছুটুছেলে লয়। ঠিক আসবেক! কিন্তু মন যে মানে না। গলা শুকনো, লালা শক্ত হয়ে আঠা, উদ্বেগ উৎকণ্ঠায়

কেবলই ভয়কাতরতা, তার মধ্যেই বর্ষার আকাশের প্যানপানানির মত ঠোঁট নড়ছে, রতন কুথা গেলি ?

মাটি গলে বিক্ষত দেওয়াল, বেঁকারি বেরুন ঘরের চাল, এক খুপরি ঘরের টিনের আগল দরজা, ঠেলে ঢুকতে যেন গিলতে আসছে একটা হাঁ-মুখো রাক্ষসের মত। ছুগ্‌গা প্রতিমার সোনালী রূপোলী রাংতা বসান শোলার মুকুটখানা বিসর্জনের সময় এনেছিল রতন, অক্ষত অবস্থায় টাঙান আছে ঘরের ভিতর, রোদ লেগে চোখ অন্ধ করে দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে কাজের জিনিষ ডাঁই হয়ে আছে। বাঁশের ছিলকে, তালপাতার টুকরো, অর্ধসমাপ্ত ঝুড়ি, হেঁসো, রঙের হাঁড়ি, হাটে নিয়ে যাবার জন্যে বাঁশের শানকি, টোকা, পেছে, কুলো, চালুনি। একদিকে মাটির কালিপড়া ভাতের হাঁড়ি, এল্যুমনিয়ামের প্যান, ডাঁটিভাঙা কাপ, কলাই-ওঠা গেলাস। হাত দিতে ইচ্ছে নেই। কাজ বন্ধ, খিদে নেই। পেটের ভিতর পাকে পাকে শুধু ব্যথার ঢেলার ঘোরাঘুরি।

আজ ছুপুরে উবু হয়ে ঘরের মেঝেয় রতনের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে মনে হয়েছে—সিনেমা, রতন সিনেমা বড় ভালবাসে গ! কে জানছেক, বাপ উখানেই আটকে আছেক কি না। এবং ভাবনাটা এতই তীব্র হয়েছে যে মানুষটা ঘর ছেড়ে এই ভরা ছুপুরে বেরিয়ে পড়েছে।

রতন বলে,—অ বাবা সিনেমা দেখলে না ত মায়ের গব্বেই থাকলে! সাদা কাপড়ে সব নাচে কুঁদে, সাদা কাপড়ে নদী হয়, সমুদ্দুর হয়, রেলগাড়ী ছুটে, এল্যুপ্লেন ছুটে। তাবাদে সি কি দেশ, কেমন ঘরদুয়োর। তাবাদে নাচ আছে, গান আছে, হুরীপরী আছে! বলি রাজেশ খান্নাকে চিন? উত্তমকুমার? ডিম্পল? জীনাত আমন? শালা ইকেই বলে মায়ের গব্ব। তাথি লেগে বলি টাকা যে জমিনছ, লিয়ে চল। আমাকে বিশ্বেস নাই, নিজে খরচ করবে। ছু'জনাতে ফুর্তি করব। তাবাদে কলকাতা যাব। দেখরে গা কলকাতাতে শালা খালি সুখ!

ঘর থেকে বেরুনর পর যতই এসব মনে হচ্ছিল ততই চরণ আকুল হচ্ছিল। চৈত্রের দুরন্ত রোদ এবং ঝোড়ো বাতাসের তীব্র স্বননে কেবলই কানের পাশে রতনের কণ্ঠস্বর। শুকনো পাতা কাঁকুরে ভুঁইয়ে কথা বলে যাচ্ছিল রতনের মত। দূরের তালের শ্রেণীর শীর্ষদেশ বাতাস পেয়ে গম্ভীর ভঙ্গীতে রতনের কথাগুলোই নাড়াচাড়া করছিল।

আহা কত কথা জানত রতন ! জানবে না, কতক্ষণ থাকত রতন এই গাঁয়ে। তার বাঁশের ঝাড়ের মাঝে এক খুপরি ভাঙা ঘরে ! সকাল সন্ধে নেই রাজনগর না হয় সিউড়ী। হাঁটলেই পিচরাস্তা। তারপর তো ভোঁ ভোঁ বাস চলছে। তারপর রিক্সাওয়ালা বন্ধুও হয়েছিল গো ! নিয়ে যেত রতনকে। তাই না দুনিয়ায় ঢেক ঢেক খবর ছেলে জেনে ফেলেছে। ট্রামে ধোঁয়া বেরোয় না, এখন রাজা নেই বিলকুল মন্ত্রী, কলকাতাতে গাড়ীতে গাড়ীতে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, পিঁপড়ের মত সারিবন্দী মানুষ হাঁটে রেডিওতে ছবি দেখা যায় সিনেমার পারা-- এসব কত কি ! হুঁ: জানে না কোন সময় গাঁয়ের মাটি কি ফসল দেয় ! জানেনা ক্ষেতগুলোয় কখন কি বীজ বুনতে হয় কখন জল দিতে হয়। জানে না ভাতের হাঁড়ি ফোটাতে কত পরিশ্রম ? জাত ব্যবসাও জানে না। ডোমের ছেলে হয়ে শিখল না বাঁশের কঞ্চির কাজ। কিন্তু তাতে কি ! শিখবে—শিখবে বৈকি একদিন !

ত্রিশূল বাউড়ি কুঁজো পিঠ সোজা করতে করতে বলেছে—তুমার বিটাটি লায়েক হন্‌, গেল চরণ !

কালো ছোপ পড়া দাঁত বার করে টিঙটিঙে সুবলা বলেছে, অমন বিটার মুয়ে মুতি !

বলছে, বলে, আরও লোকে নানান কথা বলে চরণদাসকে। কিন্তু তাতে কি !

আসলে কেউ বুঝে না গ রতনকে। মুখে হাতি মারে, ঘোড়া মারে। ত মারুক ! মা মরা ছেলে, আমি বাপ, কঠিন কথা বলতে লারি। তাবলে তুমাদের ত ক্ষেতি কিছু করে নাই ! না হয় বলে পাড়ার সব শালা মুখ্যু। বলে উর স্যাঙাতসাথীদের, তুদের সঙ্গে মিশতে ঘিন্নে লাগে ! না হয় একটুক সাজগুজ করে ! চকচকে জামা আর প্যান্ট ! মুখে পাউডার লাগায় ! চুল উল্টিন টেরি কাটে ! পায়ে চটি লাগিন ফরর ফরর চলে। সিগ্রেট ফুঁকে। বুঝি বুঝি, সব বিটার দুষ ! কিন্তুক ছুটু ছেলে ত বটে ! গোবিন্দ যে বললেক, বেঁচে গেইছ ষাঁড় ঘরে না এলেই তুমার লাভ, এলেই গুঁতুবেক ত তুমাকে ! অাঁ কথা বলা কি ঠিক হল গ ?

হু, ভাত রাঁধি আমি, রতন খালি খায়, খালি বলে, পয়সা দাও। বলে রাঁধতে শিখলে নাই। খালি পুস্ত আর ভাত। কেনে মাছ পটল আলু করতে

পার না? ভাতের থালা ফেলিক দেয়। তা রাঁধার সুয়াদ হয় না, আমার হাতের দুষ। ইতে লুকের কি বলার আছে! তুরা কেনে বাপ বিটার মাঝে কথা বলবি?

রাপ আমার লুকের কথাতে রাগ করে কুথা গেলি? তুকে বলতম্ তু আমার বিটা, আমি তুর বাপ। তু আমার বাপ; আমি তুর বিটা; ঠিক কি না বল! আমার দুষ তু বলবি, তুর দুষ আমি বলব। বলতম্, ড়ুমের ছেলে বাঁশের কাজ শিখ! অ বাপ উড়ুউড়ু মুন করিস না! সিউড়ী যাব রিক্সা চালাব, বলিস্ না। শহরের ঢেক মায়া। বলতম্, তু গাঁয়েব পুত গাঁয়েই থাক। বাপ আমার আকাশ থেকেন তুর মা নজর ফেলে রেখেছে!

গাঁয়ের শেষের খোঁড়া বোষ্টমের ঘরটাকে ফেলে কাছিমের পিঠের মত ডাঙ্গাটার উপর হাঁটতে হাঁটতে এসব কথা ভাবতে ভাবতে বুড়ো শরীর টলছিল চরণদাসের। হৃৎপিণ্ড মোচড় দিচ্ছিল। পা সামনে বাড়িয়েও মনে হচ্ছিল পিছন টান মারছে। রাজনগর কত দূর গো! বাপ আমার আছে, ঠিক! অভুক্ত শরীর, ক্ষুধা নেই, অবশ্যই, তবু কি না বড়ই দুবলা মানুষটা! বয়সও তো কম হল না!

রতন শেষ বয়সের সন্তান। হংসী কম চেষ্টা করেনি গর্ভধারণের জন্যে। জড়িবুটি, ঠাকুর থানে মানত, ওষুধ পত্তর। কিসে থেকে কি কাজ হল কে জানে, রতন এসে গেল পেটে পাকা পনের বছর একসঙ্গে ঘর করার পর।

কালোকুলে হংসী মোটেই সুন্দরী ছিল না। ঢ্যাপ ঢ্যাপ শরীর, বোচা নাক, একমুঠো চুল মাথায়, মুখের গড়নে, শরীরের গঠনে পুরুষালি ভাব। গাছ কোমর বেঁধে বাঁশ কাটত, বেঁকারি চাঁছত। হাটে যেত টোকা পেছে নিয়ে। গলার স্বরও মোটাসোটা। লোকে বলত মন্দ। কিন্তু চরণ জানত, ওর ভেতর বড় একটা মেয়েমানুষ ছিল!

বয়সের ফারাক ছিল অন্ততঃ এককুড়ি বছর দু'জনের। কিন্তু হংসী চমৎকার মানিয়ে নিয়েছিল। গাঁয়ের মেয়ে, স্বামীর ঘর করতে যায়নি। ওদিককার পুরুষটারও সাড়া ছিল না। এদিকে চরণের অবস্থাও সমান। পুচকে বৌ ঘর করতে আসে না। ঘরে বুড়ী মা আর সে। তবে বরাবরই কাজ-পাগল মানুষ বাঁশের জিনিষ বানান ছাড়া দুনিয়ার আর কোন রহস্য জানার সময় ছিল না। তার মধ্যেই টোপ ফেলল ওই মেয়ে। ঘন ঘন আসে, কাজে হাত লাগায়, 'মেলা

খেলায় গেলে জিনিষ কিনতে দেয়, চোখা চোখা কথা বলে, ধারাল ধারাল বাণ হানে শরীর তংজে। বয়সে বালিকা, কিন্তু ভাবে ভঙ্গীতে পূর্ণ যুবতী। মা মরতে চরণের ভাতের হাঁড়ি চাপানর অধিকার নিয়ে নিল। সারা পাড়ার লোক খাওয়ান পড়ল পরে। পুরুষটিকে শাসন নিয়ন্ত্রণের অধিকার তো করায়ত্ত ছিলই।

রতন জন্ম নেবার পর চরণদাসকে ছেড়ে বেটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত হংসী। যেন আর কোন মেয়ে মানুষের সন্তান হয় না। এমন ভঙ্গী কথায় কাজে দেখাত যে চরণদাসের মনে হত বেটাটাই শত্তুর। তা শত্তুর বৈকি। হংসীকে রোগে ধরল রতন আসার পরই তো! মেয়েলী রোগ। শেষ রক্ষা হল না। তিন বছরের রতনকে দিয়ে—দেখো ইকে, মরেও শান্তি পাব না—বলে একদিন চোখ উল্টে তার জগতই অন্ধকার করে দিয়ে গেল।

তারপর টিমটিমে বাতির মত রতনকে জীবনের ঝড় বাদল থেকে রক্ষা করতে করতে একটার পর একটা দিন পার হয়ে যাচ্ছে। আহা রতন বুঝবেক। ঠিক একদিন ভাল হবেক গো। মা মরা ছেলে অমুন একগুঁয়ে জেদী হয়, গো!

কৈশোর ছাপিয়ে যৌবনের ছোঁয়া লাগতে মেয়েমানুষের বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা করেছিল। নিতান্তই ক্ষুদে মেয়ে, ভীরু চাউনি, শাড়ীতে মোড়া বড় বড় কালো পুতুল। তবে একঢাল কালো চুল, আর বড় লাবণ্যময় সেই মেয়ের মুখ। ঘরে আসতে যেন রঙ ফিরেছিল ঘরের। আর চরণদাস আগামীদিনের একটা চমৎকার ছবিও দেখেছিল। মেয়েমানুষের নরম হাতের বন্ধন বড় শক্ত। আয়ত চোখের চাউনি পুরুষের চারপাশে দেওয়াল তৈরী করে দেয়।

কিন্তু দেওয়াল তৈরী হল না। রতন ধুতি পাঞ্জাবীতে পাল্কিতে চড়াতে যতখানি উৎসাহী ছিল বৌয়ের মুখ দেখে ততখানি নিরুৎসাহ হল। দিন কতকেই বলে দিল—ছিঁচ কাঁদুনিকে বাপের ঘরে পাঠিন দাও। চরণ বোঝাবার চেষ্টা করেছিল—সময়ে সব হবে। বেটা বৌকে রেঁধে ভাত দেওয়া, বাসন মাজা তরকারী কোটা, বুদ্ধি দেওয়া সবেই পাকা শাশুড়ীর ভূমিকাও নিয়েছিল। কিন্তু সময়ের অপেক্ষা করল না বেটা। নিতান্তই বালিকা বধূটিও খাঁচায় পোরা বন্য পাখির মত ছটফট করতে থাকল। তারপর বাপের ঘর যে গেল—ফিরল না। আসবে—আসবে ঠিক। চরণ ভেবেছিল। হুঁ, বেটা রতনই আনবে। যৌবনের নিয়ম অমান্তি করার মানুষ নাই দুনিয়াতে।

তিনজনের মাঝের জন রতন! এগিয়ে আসছে তারই দিকে! বাকী দু'জন কারা গো! সাঙাত? তা বাপ রতন বটে ত ঠিক? উহঁ, রতনের পারাই, কিন্তুক কিন্তুক...। আহা তাগাদা যে কেনে আসতে পারছে নাই! হেই মা কালী যেন রতন হয়। ছেলেমানুষ, দুনিয়ার ভালমন্দ জানে না। তিন-তিনরাত যে কি করে কাটিন্‌ছে। হুঁ, ঘরে যেঁয়ে আগে বলব, খা, বাপ, ভিজে ভাত রেখেছি তুর জন্যে। নিজে খাই নাই।

চৈত্রের এক ঝটকা উচ্চ বাতাস ধূলো আর শুকনো পাতা নিয়ে গা নাড়া দিয়ে গেল চরণের। খালি গা, কোমরে টুকরো কাপড়, ছেঁড়া গেঞ্জিটা কাঁধে ফেলা। দূরে যেতে এটাই সম্বল।

তিনজন নিকট হতে চরণ দেখল রতন নয়। তিনজনই অচেনা। হুস্‌ করে নিবে গেল সুখের প্রদীপ। চড়চড়ে রোদে আর পোড়ো বাতাসের ঝাপটা তার উপর বওয়া নিয়ে সে তাকিয়ে থাকল তিনজনের দিকে। এঁরা কি জানবেন গো আমার রতনকে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হল না! তিনজনেই তার দিকে একবার করে দেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পিছন ফিরে চরণ ওদের যাওয়াই দেখতে থাকল ফ্যাল ফ্যাল করে।

কুমুদপুর গাঁটা দেখা যাচ্ছে না। কাছিমের পিঠের ওপাশে লুকিয়ে আছে। গাছগাছালি ঝোপঝাড় এবং ঘরগুলো পাশের আঙুলে ভর করে দাঁড়ালে শীর্ষদেশে শুধু জানান দেবে অস্তিত্ব। এদিকে তিন পাশ খোলা। শুধু চৈত্রের শূন্য শুষ্ক ক্ষেত। আলের পর আল। মাকড়সার জাল যেন বিছান। পূবের ক্ষেতগুলো ডিঙিয়ে ঝোপঝাড় পুকুরের উঁচু পাড় লালচে ইটের ভাঁটা নিয়ে একখানা গা রোদের গা ডোবা শরীরের ছিটেফোঁটা অংশ দেখাচ্ছে।

এই সময় চৈত্রের শেষ প্রকৃতিতে যেন বিজয়া দশমীর বাজনা। শুকনো পাতা খড় ধূলো বালি পাক খেয়ে ফিরছে। চারিদিকে আম অশথ তাল খেজুরে ঝোড়ো বাতাস লাগার শব্দ! চড়চড় শব্দে মাটি ফাটার কাল হয়নি। ঘাসেরা শুষ্ক হচ্ছে। চটা উঠছে ক্ষেতের সবে মাত্র।

চারপাশেই খাঁ খাঁ শূন্যতা। কেবলই রোদের ঝলকানি। প্রাণীর চিহ্নমাত্রও নেই। আলপথও ফাঁকা। একবার চোখ বুলিয়ে চতুর্দিকে চরণ হাঁটা শুরু করল আবার রাজনগরের দিকে।

রাজনগর অজ গাঁ নয়, নাক টানলে শহরে গন্ধ মেলে। এককালে বীরভূমের

রাজধানী ছিল। চিহ্ন ছড়িয়ে আছে অতীতের চারিদিকে। সবই ধ্বংসস্তূপ। রাজার মহল, মন্দির, কালোদীঘির মাঝে প্রাসাদ, ছড়ান ছিটান বিশাল বিশাল অট্টালিকা। শুধু ঝোপঝাড়ের মাঝে দূর দিনের দীর্ঘশ্বাসই শোনা যায়। তবে এপাড়া ওপাড়া করে ঝোপঝাড়ে গাঁ খানা পেল্লাই। তারপর সরকারী সব অফিসের রমরমা। থানা, ব্লক অফিস, কৃষি অফিস, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক। কিছু হলেই ছোট রাজনগর। তারপর আছে সপ্তাহে জোড়া হাট, সিনেমা, চা মিষ্টির দোকান, কাপড়ের দোকান, মনিহারী দোকান। পিচরাস্তাও সিউড়ী থেকে সটান ছুটে এসে একে ছুঁয়ে থেমে গিয়েছে। দিনভর এখন বাস ছুটে ছুটে আসে, সাইকেল রিক্সা ছোটে প্যাঁক প্যাঁক করে।

পূব মুখেই সিনেমা ঘর। সামনে হেটে চলার মত, পিচরাস্তার দু'ধারে দোকান। চা পানবিড়ি মুড়ি তেলেভাজা! লম্বা বাঁশের খুঁটিতে চটের উপর মারা সিনেমার রঙীন ছবি! টিনের উপরও ছবি মারা। নাচের ভঙ্গীতে স্ফীত-বক্ষা এক যুবতী। এরোপ্লেন উড়ছে, ঝুলছে প্যারাসুটে মানুষ' সুন্দর চেহারার দু'জন যুবক, হাতে পিস্তল। হিন্দী বই।

প্রথম চরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ছবিখানা। এতখানি পথ হাঁকড়ে রোদের উজ্জ্বলতা কমিয়ে হ্যারিকেনের আলোর মত লালচে ভাব এনে সে যে সিনেমা ঘরের সামনে এল তার ক্লান্তি এবং অবসাদ এ মুহূর্তে থাকল না। ভিড় এখনও লাগেনি। সবই পরিচিত মুখ ঘোরাফেরা করছে। একজন সাইকেল রিক্সাওয়ালা হর্ণ বাজাচ্ছে। ওদিকে দোকানের সামনে লেজ গুটিয়ে কুকুর ঘুরছে। সিগারেট ফুঁকছে একজোড়া ছোকঁরা। না. কেউই রতন নয়। তা ভেতরে ঢুকলে বলতে লারবেক উরা রতন সিনেমা দেখতে এসেছিল কি না!

পিচ রাস্তার উল্টো দিকে উবু হয়ে বসল চরণ। চোখ আবার গিয়ে পড়ল চটে আঁকা বিশাল রঙীন পোষ্টারে! কাকে যে জিজ্ঞাসা করবে চরণ। সাইকেল যাচ্ছে ক্রিং ক্রিং বাজিয়ে। মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। ধুলো উড়িয়ে একটা জিপ গাড়ী ছুটে গেল। তা রতন ঘুরলে ঠিক চোখে পড়বে। বাবার কাছে না যাক্ ছিনেমা আসবেক গো। ধুলোর উপরই মানুষটা বসে পড়ল। তারপর কোমরের গেঁজে থেকে বিড়ি বের করে ধরাল।

—চরণদা হিথা কেনে গো! সিনেমা দেখবে নাকি?

প্রায় লাফিয়ে উঠল চরণ। ঝিমুনি এসেছিল বোধ হয়। তবে চিনতে ভুল

হল—প্রহ্লাদ। রাজনগরে ঘর। জাতভাই। ভারী আমুদে মানুষ। কুমুদপুরের জামাই। লতায় পাতায় একটা সম্পর্কও আছে ওর স্ত্রী কানিদের সঙ্গে। প্রহ্লাদ জমি চষে, বাঁশের কাজও করে। হাটে-ঘাটে দেখাও হয়।

লুঙিপরা মানুষটাকে দেখে এতক্ষণে চরণের মনে হল না বসে থেকে ওর ঘরে গেলে হত! এদিকে শেষবেলার সূর্য ঝিমিয়ে গিয়েছে। সিনেমা ঘরের সামনে ভিড় বেড়েছে। শব্দও হচ্ছে। মাইকে ঝমাঝম একটা গানের বাজনা বাজছে।

—অয় 'পেহ্লাদ। বিপদে পড়েছি ভাই, রতন তিনদিন ঘর আসে নাই। তা চোখে পড়ে নাই তুমার ইদিকে?

—উহু। গেল কুথা?

—জানিনা। বলে যায় নাই।

—তাহালে ত ভাবনার কথাই বটেক!

—ভাবলম্‌ ছিনেমা ত বড় ভালবাসে। ইখানে থাকতে পারে! তারি লেগে এসেছিলম!

—চল, ঘর দিকে চল, কথা হবেক।

—কিন্তুক রতনের লেগে বসে আছি।

—আহা এক ডুঙ্গ চা খেয়েই চলে আসব!

প্রহ্লাদের ঘরে গিয়ে চা মুড়ি খাওয়া হল। তার সঙ্গে গল্প। গাঁয়ের মেয়ে কানি। পাঁচ ছেলেমেয়ের মা। অভাবের সংসারে যৌবনেও শরীরে দৈন্যের ছাপ। ছেলেহারানর কথা শুনে গালে হাত দিল। তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল পাঁচ-গাঁয়ের সব ছেলে হারানর। কে ফিরেছে কে ফেরে নাই। ছেলে নিয়ে কতরকমের ব্যবসা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। পাশের ঘরের দু'চারজনও যোগ দিল। চরণকে বর্ণনা দিতে হল রতনের চেহারার বারবার। দেখতে পেলেই খবর দেবে সব, এবং রতন ফিরবে এমন সান্ত্বনাও দিল সকলে। গাঁয়ে এমন সহানুভূতি পায়নি চরণ, এখানে পেয়ে রতনের জন্যে কষ্টবোধ আরও উগ্র হয়ে বুকে বসল। চা মুড়ি যেন আটকেই থাকল গলায়।

প্রহ্লাদ বলল,—তাহলে চল চরণদা!

—কুথা?

—যা শুনলম, বিটা বাপকে ছাড়ুক, সিনেমা ছাড়তে লারবেক। উখানে আসবেকই।

এদিকে দেখতে দেখতে টুপ করে এখন জলের ফোঁটা পড়ার মত সূর্য ডুবে গেল। আঁধার নয়, কিন্তু একটা কালো চাদরের আস্তরণ ব্যপ্ত হয়ে উঠতেথাকল চরাচরে। দিনভর বাতাস কোথা যেন উধাও। ঢাকনা দেওয়া হাঁড়ির মত মাটির পৃথিবী! চারপাশ থেকে শুধু তাপ দিচ্ছে।

সিনেমা ঘরের সামনে এসে প্রহ্লাদ বলল, —চরণদা ইখানেই তুমি ফাঁদ পেতে বস।

—কিন্তুক ভিতরে যদি থাকে।

—সিনেমা দেখবে নাকি ? বড় সোন্দর বই। ভিতরটও দিখা হবেক।

মানুষের ঢোকার দিকে তাকিয়ে চরণ বলল, তা চল, দু'জনাতেই দেখি!

লালচে আলো জ্বলছে ঘরে। গান হচ্ছে। ছেঁড়া চটে বসে চরণ চারপাশে দেখতে থাকল। ওধারে মেয়েদের বসার জায়গা। একবার উঠেদাঁড়িয়ে রতনকেও খুঁজল। প্রহ্লাদ বসিয়ে দিল, বস, বস। এখুনি আরম্ভ হবেক। আলো নিবে সুরু হল সাদা পর্দায় কালোসাদার খেলা। মানুষজন বাগান ঘরবাড়ী রাস্তাঘাট। কিছুক্ষণেই চরণ অভিভূত। যাত্রা থিয়েটার দেখেছে চরণ, কিন্তু সাদাপর্দার খেলা দেখা জীবনে এই প্রথম। কোথা লাগে যাত্রা থিয়েটার! ভুলে গেল চরণ রতনের কথা। সাদা পর্দায় হিন্দী কাহিনী চিত্রের কুশীলবেরা এক ভিন্ন জগতই তৈরী করে দিল। এবং চরণদাস ভাষা না বুঝলেও কাহিনীর মধ্যে টের পেল সমস্যাটা। নায়িকার বিয়ের রাতেই কাণ্ড। বিয়ে হতে দিচ্ছে না ভিলেন। তারপর ঘটনার ঘনঘটা, গাড়ী ছোটা, এরোপ্লেনে ফাইট, নাচ গান, তার সঙ্গে প্রাসাদোপম অট্টালিকা, বিচিত্র সজ্জার মানুষ এবং বিবিধ আজব অদেখা সামগ্রী তার দু'চোখে মুগ্ধতার আবেশ এনে দিল।

সিনেমা শেষ হতে প্রহ্লাদের সঙ্গে ঘরে ফেরার পথে রাজনগর রতন কিছুই থাকল না। থাকল শুধু কিছু চমৎকার মুখ, কিছু দৃশ্য, এবং অদ্ভুত রহস্যজনক এক জীবন কাহিনী।

রাতে ফেরা হল না। সকালে কুমুদপুর এল চরণ। প্রহ্লাদ এগিয়ে দিয়ে-গেল কিছুটা। রতনের কথা নয়, মানুষটা যে সিনেমাতে মোহিত তা বুঝে ফেলেছে প্রহ্লাদ। আবার আসবে হাতে। পয়সাকড়িও আছে বুড়োর। মুফতে দেখা হবে তার সিনেমা। এদিকে ঘরে তো হা হা দৈ দৈ। চাষ করলেও পরের

জমি, পেট চলে না ঠিকঠাক! আবার ঘরের মেয়ে মানুষ ধরুচেও বটে। সংসার মানেই যন্ত্রণা। এর মধ্যে অন্তের ঘাড়ে চেপে যতটুকু সুখ নেওয়া যায়।

—আবার আসছ ত চরণদা। ইপাশে আমিও খুঁজ রাখছি।

—আসব পেহ্লাদ। দেখিগ্যা ঘরে রতন এল কি না।

—তা এলেও খবর দিও আমাকে। ভাবব নাহালে।

—তা দুব।

—না এলে কিন্তু সিনেমা ঘরের ফাঁদটা ভুলো না। বিটা ই ফাঁদে পড়বেকই ই তল্লাটে থাকলে!

সকালে রোদে হাটতে হাঁটতে চরণের মাথায় ঘুরতে থাকল পর্দার মুখগুলো, উত্তেজক ঘটনাগুলো, গানের সুর নাচের ভঙ্গী। সকাল থেকেই চড়চড়ে রোদ। ঝোড়ো বাতাস এখনও সুরু হয়নি। ফলে রোদ বিঁধছে গায়ে। ঘাম জমেছে। পাখপাখালি উড়েবেড়াচ্ছে। আগে আগে একটা মানুষ গরু নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মনে হল কেষ্ট বাউড়ী। লম্বা পা ফেললে হয় ত ওকে ধরা যায়। রতনের কথাও জিজ্ঞাসা করা যায়। কিন্তু এগুল না চরণ। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। কুমুদপুর আর কতটুকু পথ! সিনেমার কথা ভাবতে ভাবতে পথখানাও যেন ছোট হয়ে গেল। নিজেই অবাক চরণ! এত তাড়াতাড়ি ঘরে পৌঁছে গেল! না রতন ফেরেনি। একটা চাপা শ্বাস পড়ল।

এক মানুষ গিয়েছিল একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে ঘরের টিনের আগল খুলল চরণ। তারপর রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ক'দিন ভাত জোটেনি। প্রহ্লাদও মুড়ি খাইয়েছে। আজ ভাত খেতে হবে। ভিজে ভাত ত মদ হয়ে গিয়েছে। লালা কাটছে। তারপর রাজনগর! আজ কি দেখাবে সাদা পর্দা!

প্রহ্লাদ কম অবাক নয়। বুড়ো মানুষটার কি যে হয়ে গেল! মুখে কেবল সিনেমার গল্প। এত বাড়াবাড়ি যে হয়ে যাবে তা মোটেই ভাবে নি প্রহ্লাদ। দেখাতেই আমোদ তার। আর ও নিয়ে কিছুই ভাবে না।

কিন্তু চরণের ভাবনার যেন শেষ নেই। শুধু দেখা নয়; নায়ক নায়িকার নানান সমস্যা, দ্বন্দ্ব, ভিলেনের শয়তানি চরিত্র, বন্ধুর গুপ্তশত্রুতা, পুত্রের পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রেমে, জীবনে যেন তোলপাড় করে তাকে। ওদের সুখ দুঃখ হাসি আহ্লাদের সঙ্গী হয়ে যায় সে। যেন ছবি নয়, সত্যিকারের জীবনকে সে দেখে। কখনও দুঃখে কখনও আহ্লাদ উচ্ছ্বাসে সে প্রহ্লাদের সঙ্গে আলোচনা

করে। নিরুৎসাহী প্রাহ্লদের উপর বিরক্তও হয়। মোটকথা দিনকয়েক হিন্দী বাংলা বই দেখে গান বাজনা সাদা পর্দার আলো আঁধারে খেলা মানুষটাকে ঘোর মায়ায় ফেলে দেয়। বিকেলে সিনেমাঘরের সামনে এমপ্লিফায়ারে গান, চটের রঙীন ছবি সাঁটা, মানুষের যাতায়াত, তারপর উবু হয়ে বসে আলোর মায়ায় সে পোকার মত চিটিয়ে থাকে!

কানি বলল,—তুমি খুব সিনেমা দেখছ!

—আহা না দেখলে যি রতনকে দেখতে পাব নাই।

—বাইরে বসে থাকলে পার!

—তা পারি। কিন্তুক সময় যি কাটে না।

প্রহ্লাদ বলল,—বুঝলে বুড়ো বয়সে এমন সিনেমা দেখা ভাল নয়।

—কেনে?

—চোখ খারাপ হবেক।

—ধুস তাহলে এত লুক দেখে কেনে?

—কিন্তুক রতন ই তল্লাটে না থাকলে ত আসবেক নাই।

—আসতে হবেকই। বাবা, এমুন ফাঁদ পেতেছি! চরণ খুসীতে মাথা দোলাল,—তুমি ঠিক বলেছ, ছিনেমা ছেড়ে বিটা আমার থাকতে লারবেক।

প্রহ্লাদ চুপ করে গেল। বুড়োর পয়সা আছে। জমান টাকা আনছে। স্ফূর্তি হচ্ছে তাতে তারও হোক না!

কিন্তু প্রহ্লাদকে অবাক করে দিয়ে সত্যি সত্যি ফাঁদে পড়ল রতন। চরণ বিকেলের কালচে রোদে দেখল শাড়ীপরা এক মেয়ের সঙ্গে রতন দাঁড়িয়ে। হুঁ রতন। সেই জামা, পাজামা, ঠোঁটে বিড়ি। মেয়েমানুষের গোলাপী শাড়ী, গোলাপী ব্লাউস। কালো শরীরে বড় উগ্র হয়ে ফুটে উঠেছে রঙটা। হাসতে হাসতে গল্প করছে রতনের সঙ্গে। সামনেই সিনেমার গেট। মাথার উপর পোষ্টারে রঙীন ছবি। তার পাশে টিনের ঘের। বাদাম চানাচুরওয়ালা বসে আছে। সামনে ছোট একটা জটলাও।

বারকতক দেখতেই হুহু করে যেন বুকের ভিতর দমকা বাতাস ঘুরে বেড়াতে থাকল চরণের। মাটির সঙ্গে গেঁথে গেল পা। ছুটে গিয়ে 'বাপ আমার'—বলে জড়িয়ে ধরার শক্তিও থাকল না। শরীরের সব রক্ত শুধু বয়ে যেতে থাকল শিরা

উপশিরায় দুরন্ত গতিতে। যা শুধু শরীরময় এক অসহ যাতনা বাড়িয়ে তার চেতনার বুদ্ধির শক্তির সব দ্বার রুদ্ধ করে দিল।

প্রহ্লাদ পাশেই ছিল। বলল, কি হল ?

বিকৃতস্বরে চরণ বলল, রতন !

কই ? কই !—উত্তেজিত হয়ে কাঁধ ধরে চরণকে প্রায় ঠেলে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল প্রহ্লাদ।

রতন কিছু বলার আগেই হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকল চরণ—অরে বাপ, কুথা ছিলি ! বাপকে মনে নাই তুর ! আমি দুনিয়া ঢুঁড়ে বিড়াছি, তুর লুনা কত কষ্ট হনছে···তুর মা থাকলে··।

লোক জমা হয়ে গেল ওদেরকে ঘিরে। মেয়েমানুষও জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রহ্লাদই সরাল লোক। চরণের কান্নাও বন্ধ হল। তারপর রতন যা বলল, তা হল, সিনেমা দেখতে এসে বৌকে দেখতে পায় সে। দাদার সঙ্গে এসেছিল সিনেমা দেখতে। দেখা হতে কথাবার্তা হয়। তারপর শ্বশুরবাড়ী যায় রতন। অসুখে পড়েছিল ওর খুড়শ্বশুর। সকালেই কুমুদপুর ফেরার কথা। খুড়শ্বশুড় মারা গেল। আর তো ফেরা যায় না ! দু'দিন দেরী হল। তারপর কুমুদপুর গিয়ে রতন বাপকে দেখতে পায় নি। খোঁজ নিয়ে জেনেছে বাবা নাকি তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে ! তাই আবার শ্বশুর ঘরেই ফিরে গিয়েছে। আজ বৌকে নিয়ে সিনেমা দেখতে এসেছিল !

শুনে অভিমানাহত গলায় চরণ বলল, তা তু গাঁয়ে গেইছিলি কেউ ত বলে নাই ?

—সুবলদার সঙ্গে দিখা হন্‌ছিল। উকে সুধিনছ ?

—উঁহু। আমি ত পেহ্লাদের ঘরে থাকি বাপ। কুমুদপুর যায় নাই।

—তাহলে।

বেটার সঙ্গে এমন অভিমান চলে না। ফিরে পেয়েছে সেই সুখের ঢেউ আছড়াচ্ছে বুকে। তারপর এই মেয়েমানুষ যে পলকা নিতান্তই বালিকা সে বৌ জেনে সুখের উপর সুখ। ফাঁদ পাতা সার্থকহয়েছে। এখানের মাটি আঁকড়ে ছিল বলেই না এত সুখ। রতনকে ফিরে পাওয়া, সঙ্গে আবার বৌ।

সিনেমা মাথার উপর তোলা রইল। প্রহ্লাদের ঘরে বৌ বিটাকে নিয়ে

উঠল চরণ। কিছুতেই ফিরতে দেবে না সে শশুরঘরে। কুমুদপুরে যেতেই হবে।

প্রহ্লাদ বলল,—সেই ভাল। বাপ হামলে বিড়াছিল তুমাকে। কুমুদপুরেই যাও। আমি না হয় তুমার শশুর ঘরে খবর দিন্ দুব।

রতন বলল, বাবা যখুন এমুন করছেক, তাই যাই। ঘোমটা ঢাকা বৌকে বলল, হ্যাঁ গ কি বলছ?

ঘোমটা ঘাড় কাৎ করে পরিপূর্ণ সায় দিল!

রাজনগর পার করে দিয়ে প্রহ্লাদ বলল,—তাহলে চরণদা বিটা ত পেলে আর আসছ নাই!

—সি কি কথা। আসব বৈকি! চরণ একগাল হাসল—কিন্তুক সময় কি পাব! এখুন ঢেক কাজ। বিটাকে চাষে নামাতে হবেক। বৌট ডাগর হনছেক। উকে বুঝতে হবেক, পুরুষ মানুষে বান্ধায় রাখ, কাজ করাও। তবে সময় পেলে আসব।

—বিটা ইবার তুমার কাজ করবেক! আর উড়বেক নাই!

—কেনে?

চাপা স্বরে বলল, মেয়েবুয়ের আঁচলে ইবার বি বাঁধা পড়ছেক।

কুমুদপুরের ঘরে বৌ বেটাকে নিয়ে পৌঁছাল চরণ সকালেই। বৈশাখের খরা দিন। গুমোট গরম। বাতাস নেই। আইঢাই করছে প্রকৃতির মত মানুষজন দুরন্ত সূর্যের দাপটে। কিন্তু মানুষটার গ্রাহ্য নেই। চাল ডাল তেল নুন জোগাড় করে রান্নার আয়োজন করে ফেলল। বৌ আমি রাঁধব—বলতে আহ্লাদে ডগমগ। পাড়ার লোকের কাছে রতন আর বৌকে কিভাবে বের করেছে তার গল্প বলে বলে মুখে ফেনা ভেঙে ফেলল। পড়শীরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে বলে,—ছেলে তাহালে তুমার ছেলেধরার হাতে ধরা পড়ে নাই, মাগের আঁচলে লুকিন ছিল—বলাতে নিজেও খুক খুক করে হাসল। রতনযে খুব চালাক বৌমা যে ছেলেকে বেঁধেছে সমবয়সীদের কাছে চাপা স্বরে বলে যেন নিজের যৌবনের সুখকেই আঁচলা আঁচলা তুলে ফেলতে থাকল। তার সঙ্গে কান্নাও আছে। সুখের কান্না।

—বাপ রতন আর বাইরে মুন করিস না। কাজ শিখ বাপের। নাহালে কারুও জমি চাষ কর।

—করব বাবা। বৌট মোড়া-টোকা পেছে করতে জানে খুবি ভাল।

—তাই নাকি ? তাই নাকি ?

—হুঁ। রতন ঘাড় ঘুরিয়ে বৌকে দেখল। ঘোমটার আড়াল তুলে বৌ চোখ মটকাচ্ছে।

বিকেলের ঢল নামতেই রোদে প্রকৃতিতে বুড়ো মানুষটা অন্যরকম হয়ে গেল। কাঁধে গামছা ফেলে বলল,—রতন তুরা থাক। আমি আসছি।

—কুথা যাবে তুমি আবার ?

সামান্য লজ্জাজড়ান স্বরে চরণ বলল,—রাজনগর বাপ। আজ নতুন বই আসবেক ছিনেমাতে।

কালাপাহাড়

অজিত হাজরা

মরে না। ওরা মরে না। এই যেমন কচুরিপানা পুকুর পাড়ে রোদে পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। কিছুই থাকে না। নাম ঠিকানা ভুলে যায় গাঁয়ের মানুষজন। কিন্তু একদিন ব্যাঙ ডাকলে ঠিক দেখা দেয়। এমনি কালাপাহাড়। ইতিহাসের সেই বাজে মানুষটা, যে মন্দির থেকে মূর্তি সরিয়ে মনে করতো কাজের কাজ করছে। কবে মরে হেজে গেছে। তবু কালাপাহাড় দেখা দেয়।

সপ্তমীর দিন দেবীপুরে সেই কাণ্ড। কে জানি দেবী মূর্তি সরিয়েছে। ভোরবেলা দেবীদীঘির পাড়ে কী ভিড়! গাঁয়ের মানুষজন জলে নেমেছে পানা সাফ করতে। আর মুখে এই এক কথা—কালাপাহাড়!

পুকুর পাড়ে দেবী মন্দির। এই মন্দির অনেক কালের। ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেয়া যায়।

ছশো বছর আগে। যখন গৌড়ের সুলতান ইলিয়াস শাহ আর টাকায় আটমণ চাল তখন। নৃসিংহ সামন্ত মন্দির বানিয়েছিলেন। জোড়বাংলা চাল আর দেয়ালে পোড়া মাটির দশমহাবিদ্যা—বগলা, ছিন্নমস্তা, ষোড়শী এই সব। কে যেন সামন্তকে বলেছিল, না পুড়িয়ে ঘিয়ে ভেজে নিলে ইট খুব টেঁকসই হবে। যে কথা সেই কাজ। আর দেবী মূর্তি কাশী থেকে আনানো। নিকষ কালো কষ্টি পাথরের ষোড়শী। রূপের তুলনা হয় না। আয়তনয়না, স্ফুরিত নাসা, দশভুজা।

মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা দেদার ঢাক ঢোল পিটিয়ে। সামন্ত মায়ের নামে লিখে দিলেন একশো বিঘে জমি। দেবীর নিত্য-পুজো হবে। আর দেবীই যখন মা দুর্গা, আলাদাভাবে দুর্গা পূজা হবে না। সেই তিনদিন দেবীরই পুজো হবে ঘটা করে। তার সাথে মেলা।

কতকাল মেলায় লোক আসছে, এদিকে দামোদর ওদিকে ময়ূরাক্ষী থেকে। ভালুকের সাথে মানুষের লড়াই দেখতে। দেখে আর বলশালী মানুষ পেশী চাপড়ায়। আস্তে আস্তে গায়ের জোর কমে আসে। তখন বানর বানরীর নাচ চালু হয়। মানুষজন বুদ্ধির তারিফ করে। আর মেলায় সামন্তর খিচুরি ভোগের ব্যবস্থা। পেট পুরে খেয়ে আবার মুড়ি মুড়কি, পিঠেপুলি, মণ্ডা মেঠাই। আস্তে দুধ ঘি ফুরিয়ে আসে। তখন শুধু মুড়ি মুড়কি। আর মেলা দেখতে-আসা গাঁয়ের গিন্নীরা কিনছে মাটির হাঁড়ি, বেতের ঝুড়ি, কর্তারা কাস্তে কুড়ুল কোদাল ফাওড়া। ঘরে ডবকা ছেলে, হাল বাড়াতে হবে। সামন্ত বলেছেন, চাষে বড় রস যদি থাকে জন দশ।

আস্তে আস্তে ছেলেরা এনট্রান্স, ম্যাটিক পাশ করে। চাকরী পায়। তখন বেটার বৌয়েরা পাছাপাড় শাড়ি কেনে। মেলা দেখে ঘরে ফেরার আগে সবাই দেবীকে গড় হয়ে প্রণাম করে। ঠাকুরমশাই বলেন; আসচে বছর আসিস। বেঁচে থাকলে তারা আসে। আর আসতে আসতে কেটে যায় অনেক কাল। এর মধ্যে এক দুর্যোগ।

ক্রুদ্ধ ভল্লুকের মত কালাপাহাড় আসছে। দেবীর কী হবে? সামন্তর বুক কাঁপছে। পেশীর সে জোর নেই। বয়স আর ব্যাধি ভাগাভাগি করে খেয়েছে স্বাস্থ্য। তবু গলা কাঁপল না। বললেন, বেঁচে থাকতে কালাপাহাড় মাকে নিয়ে যাবে? ছেলে বীরসিংহ বললেন, না। রুখে দাঁড়ালেন ডোম বাগদিদের নিয়ে। খালি হাতে ফিরে গেল কালাপাহাড়।

পরের বছর বৃদ্ধ নৃসিংহ চোখ বুজলেন। তার আগে বীরসিংহকে বলে গেলেন -কালাপাহাড় আবার আসবে।

বীরসিংহের খেয়ে সুখ নেই শুয়ে শান্তি নেই। লড়াই করে মরতে পারেন। হার জিতের কথা তো বলা যায় না জিতে গেলে কালাপাহাড় দেবীকে নিয়ে যাবে তাঁর মৃত দেহ মাড়িয়ে মাড়িয়ে। তাহলে যে তিনি মরেও শান্তি পাবেন না। এখন উপায়? ইচ্ছে থাকলেই বুঝি উপায় হয়। বীরসিংহ দেবীকে রক্ষা করার উপায় বের করলেন অনেক ভেবে। পুরোহিতকে বললেন, মায়ের আদেশ তিনি পাতালবাসিনী হবেন। শুধু দুর্গাপূজার তিনদিন ছাড়া। দেবী-দীঘির ঈশান কোণের গভীরে তাঁকে রেখে আসা হোক। সপ্তমীর দিন তুলে

এনে মন্দিরে স্থাপনা করা হবে, দশমীতে আবার যথাস্থানে। নিত্য-পূজা যেমন চলছে চলবে।

মায়ের আদেশ, কারও কিছু বলার নেই। যদি ব্রাহ্মণ কিছু বুঝে থাকেন। সামন্তর বুদ্ধির তারিফ করলেন। আর সেই ব্রাহ্মণ নিত্য পূজার সুবিধের জন্যে বেদীমূলে সিঁদুর লেপে তৈরী করলেন চমৎকার প্রতীক।

তারপর যেমন হয়ে থাকে। কালস্রোতে ভেসে যায় গৌড়ের সুলতান, দিল্লীর বাদশাহ এবং লণ্ডনের কিংএমপারার। আর দেবীপুরে বীরসিংহ, প্রতাপসিংহ হতে হতে মানসিংহ কিন্তু সব কিছু ভেসে যায় না। যেমন, দেবীপুরের সেই ট্রাডিসন, সেই সামন্ত বংশ। এসবও থেকে যায়—ধান ক্ষেত, গাছ-গাছালি, মানুষজন, ঠাকুর দেবতা।

হায়! দেবীপুরে দেবী নেই। সেই যে নৃসিংহ বলেছিলেন, কালাপাহাড় আবার আসবে। যথার্থই তাই। এতকাল পর।

সপ্তমীর সকাল। পাতালবাসিনী দেবীকে তুলে এনে মন্দিরে স্থাপনা করা হবে। বৃদ্ধ পুরোহিত দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে। তাঁর পেছনে গাঁয়ের মানুষজন। কিন্তু মানসিংহ নেই। বিশেষ কারণে অনুপস্থিত নৃসিংহ সামন্তর বংশধর, যিনি জনসন অ্যাণ্ড জনসন কোম্পানীর বড়বাবু। শয্যাশায়ী। কোমরে ভীষণ ব্যথা, হট ব্যাগ চাপিয়েছেন। আর দাড়ি কামাতে পারেন নি। হাত বোলাচ্ছেন একবার মুখে আর একবার পাছায়।

—শুয়ে আছো কী গো? মানসিংহের স্ত্রী শোবার ঘরে ঢুকে গালে হাত দিলেন। সবাই যে তোমাকে খুঁজছে।

—আমাকে খুঁজছে কেন?

—শোন কথা। দেবী আসছে, তুমি না থাকলে হয়। ওঠো ওঠো।

—আমি যাবো না।

—তুমি কী গো? সরলা মুখ ঝামটা দিলেন—তোমার জন্যে মান, ইজ্জৎ আর রইল না।

—আমার ওঠার ক্ষমতা নেই। সামন্ত কাতরাচ্ছেন—ছেলে দুটোর একটা থাকলে হতো।

—তোমার কি কিছুই মনে থাকে না! কমল তো লিখেছে পূজোয়

দার্জিলিং যাবে। আর অমলকে তুমিই তো মাছ দিয়ে কোথায় পাঠালে।

—অ। সামন্ত ভাবনায় তলিয়ে যাচ্ছেন। অমলের জন্যে ভাবনা। সরলা বললেন, ওই শোন ঢাকে কাঠি পড়ছে।

—কী বললে? চমকে উঠলেন মানসিংহ।

—কাণের মাথা খেয়েছো নাকি? সরলা আঁচল সামলাতে সামলাতে দে ছুট। মা মন্দিরে আসছেন। সপ্তমী অষ্টমী নবমী, বাবা। দশমীতে বিদায় হবো। দেহ আজ্ঞা পশুপতি। পশুপতি আজ্ঞা দিয়েছে। মা আসছে।

নিরিবিলি মানসিংহ ভাবছেন···সাহেবের সুবো হলে এক কথা। খুশী করতে পারলেই কাজ উদ্ধার। কমলকে কেমন টুক করে ঢুকিয়ে দিলাম রবার্ট সাহেবকে মাছ খাইয়ে। ওরা দিশী ব্যাটারা খেয়েই যাবে, কাজের বেলায় ঢু ঢু। ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। তক্কে তক্কে থাকি জাত সাহেব পেলেই ধরবো। পেলাম তো পেলাম খাঁটি মারকিন সাহেব। নিশ্চয় হয়ে যাবে···তিনি পাশ ফিরলেন অতি কষ্টে। এই বয়সে কোমরে খেঁচকা লাগা, সামলে উঠতে পারলে হয়।

এদিকে দেবীদীঘির পাড়ে পুরোহিতের ব্যাকুল কণ্ঠ—মা উঠে এসো মা, উঠে এসো। তাঁর সাথে আরও দুজন ব্রাহ্মণ। তিনজন জলে নামলেন—মেয়েরা শাঁখ বাজাও উলু দাও। সরলা গাঁয়ের ছেলেদের বললেন—মায়ের সিংহাসন আন।

সব ঠিকঠাক। ফুলের মালা, ধুপের কাঠি। জয়ঢাক কাঁসর ঘণ্টা। আর দেবীর সিংহাসন। দীঘির ঈশান কোণে তিন জোড়া হাত ঘুরছে কিন্তু আড়াই হাত কষ্টিপাথর কারও হাতে ঠেকছে না। মা কই গো? ব্রাহ্মণদের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা থেকে হতাশা। মা অন্তর্ধান করেছেন।

পাগলিনী প্রায় সরলা ছুটে এলেন মানসিংহের কাছে।

—ওগো, সব্বোনাশ হয়েছে।

—কার?

—আমার।

—কী করে?

—মা নেই। মা—

সরলার মুখে কথা সরছে না। দুচোখে বন্যধারা। মানসিংহ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন। সাধে কী বলে মেয়েমানুষ বারো হাত কাপড়েও ন্যাংটা। গা উদোম করে কাঁদছে ঢাখো! তিনি বললেন, মা তো তোমার একার নয়। তুমি কেঁদে ভাসাচ্ছো কেন? ঠাকুরমশায়কে খবর দাও।

তার আর দরকার হয় না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজেই এসেছেন। সরলা গায়ে আঁচল তুলে সরে দাঁড়ালেন। দরদালানে একখানি দেবীর পট। সেদিকে মুখ তুলে মানসিংহ তাকিয়া ঠেলে দিয়ে উঁচু হলেন। কণ্ঠস্বরে বিশুদ্ধ উদ্বেগ।

—কী হয়েছে ঠাকুর মশায়?

—বড় অলক্ষুণে ব্যাপার। কালাপাহাড়—

—চুপ করুন। সামন্ত হাঁপাতে থাকেন। আর ব্রাহ্মণ বিরস মুখে জিজ্ঞেস করেন—কী হবে কর্তাবাবু। আর সরলা ঘুরে দাঁড়ায়—কার পাপে এই অলক্ষুণে ব্যাপার?

সামন্তর মুখে জবাব নেই। বেশ ভেবেচিন্তে গভীর গলায় বললেন—ভাল করে খুঁজে দেখুন। মেয়েছেলের মত কেঁদে ভাসাবেন না।

এদিকে দীঘির পাড়ে ভিড় বাড়তে থাকে। মেলার ভিড়। মেলার আলতু ফালতু লোক। শহরের ফেরিওয়ালা, ভিন গাঁয়ের বাজিকর, চোর ছ্যাঁচোর, পকেটমার এসবও আছে। সিউড়ি—বর্ধমান রুটের বাস দেবীপুরে দুমিনিট দাঁড়ায়। মেলায় আসতে কোন অসুবিধে নেই। তারা মজা দেখছে। কালাপাহাড়ী নতুন মজা।

মানসিংহের কথামত কচুরিপানা সাফ। চারটে ডুনি চলছে। তবু বারো হাত জল। পাড়ার একটি পলিটেকনিকে পড়া ছেলে দশটা বাজতে মানসিংহের খাটের পাশে দাঁড়াল—দাদু, ডুনী দিয়ে হবে না। বর্ধমান থেকে চার হর্স-পাওয়ার ডিজেল পাম্প নিয়ে আসবো? মানসিংহ ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন—যা ভাল বোঝো করো ভাই। আমি কিছুতেই আপত্তি করব না।

—কাল মাছ ধরালেন, পাঁকে পুঁতে টুঁতে গেছে।

—তাই হবে। তাই হবে। সামন্তর গলা শুকিয়ে যায়—তবে অলৌকিক ব্যাপার আজও ঘটে। দেবী অন্তর্ধান করেছেন এমনও হতে পারে।

অনুমতি পেয়ে ছেলেটা চলে যায়। দাদুর বস্তাপচা বাতেলা শুনতে দাঁড়িয়ে থাকে না।

মানসিংহ প্রাচীন পালঙ্কে শুয়ে থাকেন। দেখাংগ শরতের সুনীল আকাশে চক্রাকারে ঘোরা সোনালী চিল। আর ভাবনা পাক খেতে থাকে।... আইবুড়ো মেয়েকে পারা যায় কিন্তু বেকার ছেলে অপার। যাকে বলে গলার কাঁটা। না যায় গেলা, না যায় ওগরানো। এবার যদি গলা দিয়ে নামে। অমল চাকরী পেলে আমি বাঁচি...তিনি ঘরের দেয়ালে টাঙানো অয়েল-পেন্টিং দেখছেন। পূর্বপুরুষদের ছবি। নৃসিংহ বীরসিংহ ইত্যাদি। তাঁর নিজের ছবি নেই। এতবড় একটা অয়েল পেন্টিং করানোর অনেক খরচ আজকাল। আর অফিসের বড়বাবুর ওরকম রাজরাজড়ার মত পোষাক বড় বেমানান। তাঁর নিজের চোখেই খারাপ লাগবে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গচ্ছতি গচ্ছতি ইতি জগৎ। কিছুই থাকে না। এরকম যখন ভাবছেন, নজর নৃসিংহ সামন্তর ওপর। বড় বিবর্ণ মুখ চেনাই যায় না। তবু তাঁর মনে হয় এই মুখ অমলের সঙ্গে বড় মেলে। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করেন...অমল তোমারই বংশধর। তুমি তাকে আশীর্বাদ করো। আশীর্বাদ করো সে যেন চাকরীটা পায়।...

ছানি চলতে থাকে। পাম্প চলতে থাকে। বেলা গড়িয়ে দুপুর। আর জল গড়িয়ে পাঁক। অনেক হারানো বাসন, লোহালক্কড় বেরোয়। উৎসাহী কেউ চেঁচিয়ে ওঠে, পেয়েছি। মানসিংহ শুয়ে থেকে শুনতে পান। পরক্ষণেই আর একজন বলছে, নাহ্ কিছু নয়। সরলার ভাত বসিয়ে ঘর বার করাই সার।

দেবীর আশা সবাই ছেড়ে দিল। তাই বলে পূজা বা মেলা বন্ধ রইল না। সন্ধ্যে হতেই দেবীতলা আলোয় আলো, আওয়াজে আওয়াজ। কিন্তু বেশীর ভাগ কথা দেবীকে নিয়ে। এমন কালাপাহাড় কে?

মানসিংহ প্রাচীন পালঙ্ক থেকে নেমে এসেছেন। মন্দিরের দাওয়ায় বসে পাঁচ মুখে পাঁচকথা শুনছেন চুপ করে।—কোন্ শালা তুলে নিয়ে গিয়ে ঝেড়ে দিয়েছে কুরিওয়ালাদের কাছে।—গাঁয়ের লোক নিশ্চয় নয়।—কেউ তো চোখে দেখেনি কালাপাহাড়টিকে. বলা মুস্কিল। এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে

মানসিংহ বললেন, দেবী অন্তর্ধান করেছেন। তাঁর কথা বিশ্বাস করল ডোম বাগদিরা। তারা তখনও মনে করে, অলৌকিক ব্যাপার ঘটে।

যথার্থই তাই।

অমল সিংহ ফিরে এসেছে এইমাত্র কলকাতা থেকে। একমুখ হাসি নিয়ে। মেরে দিয়েছে পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী। এই বাজারে সামান্য বি. এ. পাশ ছোকরা। সেই যে খড় জড়ানো পাকা রুই মাছ দিয়ে মানসিংহ পাঠিয়েছিলেন তাতেই কেল্লা ফতে।

সরলা যখন উদাস বসে আছেন উনুন জেলে, তখন কোমরের ব্যথা মানসিংহ ভুলে যাচ্ছেন ছেলের কথা শুনে।—জানো বাবা, খড়বড় খোলার পর সাহেব মহা খুশী।—হোয়াট আর্ট! সাহেবের নিঃশ্বাস পড়ছে না—হোয়াট লাইফ! সাহেব মুখ তুলে তাকালেন—য়ু ক্যান জয়েন আফটার দা হলিডেস।

বন্দরের কাল — রত্নেশ্বর বর্মণ

নলিনীবাবু আচমকা রিটায়ার করলেন। সহকর্মী সবাই ভেবেছিল, তিনি নিজেও ভেবেছিলেন, কোম্পানী অন্তত একবছর তাঁর চাকরীর মেয়াদ বাড়িয়ে দেবে। রিটায়ার হবার দু'দিন আগে জানা গেল, তাঁর চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন না-মঞ্জুর হয়েছে। তবে কেন জানি নলিনীবাবু তার জন্ম দুঃখবোধ করলেন না।

এ কোম্পানীতে একনাগাড়ে গত আটত্রিশ বছর কাজ করছেন নলিনীবাবু। খুব সাধারণ অবস্থায় কাজ সুরু করে তিন-তিনটে পদোন্নতি হয়ে তিনি কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে ঘেরা-ঘরের কাছাকাছি এসে পৌচেছিলেন। অবশ্য এর মধ্যে অনেক জুনিয়রও তাকে ডিঙিয়ে অফিসার হয়ে ঘেরা-ঘরে ঢুকে পড়েছেন। আশ্চর্য, এসবের জন্ম কেউ কোনদিন নলিনীবাবুকে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ করতে শোনেনি।

নলিনীবাবু অফিসের কোন ঝুটঝামেলায় থাকতেন না। তিনি ইউনিয়নের নেতা হননি কখনও, ক্লাবের মাতব্বরও না। উল্টোদিকে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কানে কখনও কোন ফুসমন্তরও দেননি নিম্নতন কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে। বস্তুত অপরের ছিদ্রান্বেষণে উৎসাহী লোকেরাও তার কোন দোষ আবিষ্কার করতে পারেনি।

এমনি অত্যন্ত সাদামাটা, আটপৌরে মানুষটি অবসর গ্রহণের সময়ে সারা অফিসময় একটা গুঞ্জরণ সৃষ্টি করলেন। কোন কর্মীর অবসর গ্রহণ কালে কোম্পানীর পক্ষ থেকে বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেই সম্বর্দ্ধনা সভায় বিদায়ী কর্মীর এ যাবত দুর্নিরীক্ষ গুণাবলী উন্মোচন করে মানপত্র পাঠ করা হয়। কোম্পানীর বড় কর্তা, যিনি সাদা পক্ষীরাজের মত ঢাউস গাড়ী থেকে নেমে শুধু তাঁরই জন্ম সংরক্ষিত লিফটে চেপে তিনতলার কোণের ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকে পড়েন, তিনি সশরীরে সমস্ত বিদায়-সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত থাকেন। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ কাঁদো কাঁদো করে এক পেটেন্ট

ভঙ্গীতে ভাষণ দান করেন। যখন কোম্পানীর পক্ষ থেকে বিদায়ী কর্মীকে শান্তিপুরী ধুতি, শাল এবং বাঁকানো লাঠি উপহার দেন, তখনি ফটোগ্রাফারের ফ্লাস জলে ওঠে। তারপর তালশাঁস সন্দেশ, ক্ষীরের সিঙাড়া এবং চানাচুর ইত্যাদি সহযোগে জলযোগ সমাধা করে যে যার ঘরে ফেরে। বিদায়ী লোকটাও জনারণ্যে হারিয়ে যায়। কোম্পানীর পরবর্তী বুলেটিনের ছবিতে বড়কর্তার ঘর্মাক্ত অথচ হাসিমাখা মুখ এবং বিদায়ী উপহার প্রাপকের গদগদ মুখখানা কনট্রাস্ট সৃষ্টি করে। এমনি আবহমানকাল চলে আসছে।

নলিনীবাবু বলে বসলেন—আমার ফেয়ারওয়েলের প্রয়োজন নেই। সবাই ভাবল, লোকটা বলে কী! দু'একজন সহকর্মী জিজ্ঞাসা করল—নলিনীবাবু, আপনি নাকি ফেয়ারওয়েল নিচ্ছেন না? নলিনীবাবু সবেগে মাথা নাড়লেন। শেষে মুখার্জী সাহেবের চেম্বারে ডাক পড়ল। নলিনীবাবু এককালে মুখার্জী সাহেবকে হাত ধরে কাজ শিখিয়েছিলেন। তাই তিনি এখনো নলিনীবাবুকে সম্মান করেন। তিনি বললেন—নলিনীদ', এম. ডি. চান আপনি ফেয়ারওয়েল নিন।

নলিনীবাবু এতেও রাজী হলেন না। সকলে ভারী আশ্চর্য হল, এমনকি নলিনীবাবুকে একস্টেনসন না দেওয়ায় এতদিন যারা কোম্পানীর সমালোচনা করছিল, এবার তারা নলিনীবাবুর নিন্দা জুড়ে দিল। সব-নিন্দা-প্রশংসাকে অগ্রাহ্য করে নলিনীবাবু নির্দ্ধারিত দিনের অপরাহ্ণ চারটে আটান্ন মিনিট পর্যন্ত কাজ করলেন। তারপর হাতমুখ ধুলেন, রুমালে মুখ মুছলেন, আয়নায় মুখ দেখলেন এবং অন্য সকলের অজান্তে আটতলা থেকে লিফটে না চেপে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন।

আজ যেন প্রথম মুক্তির স্বাদ পেলেন নলিনীবাবু। এতদিনের একটা অভ্যাস থেকে, পৌনঃপুনিকতা থেকে নিরুদ্বেগ মুক্তি। এই সন্ধ্যেটা যেন অন্য হাজারো সন্ধ্যের থেকে আলাদা। তার এমনি মনে হল। তিনি জনস্রোতের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে ময়দানের দিকে এগোলেন। কার্জন পার্কের যাবতীয় গাছপালা, লোকজন সবকিছু পরম ঔদাসীন্যের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। একসময় ময়দানে এসে একেবারে জনবিরল উন্মুক্ত জায়গায় বসে পরম সুখে নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলেন। যেন দীর্ঘদিন তিনি অমন সুখে নিঃশ্বাস নিতে পারেন নি। নিজের অতীতের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরালেন, একবার

ভবিষ্যতের দিকে। একবার পেছনের দিকে, একবার সামনের দিকে। বাইনাকুলার দিয়ে দূরের দ্রষ্টব্যকে মানুষ যেভাবে দেখে, নলিনীবাবু তেমনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আশ্চর্য, তার স্মরণ-শক্তি খুবই সতেজ মনে হল। তিনি দূর অতীতের অনেক ঘটনা অভ্রান্তভাবে স্মরণপথে আনলেন। যেমন—কৈশোরে কুল চুরি করে খাওয়া, তার বিয়ে, প্রথম সন্তানের জন্ম ইত্যাদি।

তার অফিসের কথা মনে হল। একটা ঘরের বদ্ধ চৌহদ্দীর মধ্যে তিনি জীবনের আটত্রিশটি মূল্যবান বছর অতিক্রম করেছেন। এতদিন ধরে দারুণ দক্ষতার সঙ্গে তিনি কোম্পানীর হিসাব মিলিয়েছেন। কোনদিন ভুল হয়নি বিশেষত কর্মজীবনের শেষ দশটি বছর তিনি একনাগাড়ে কাজের পেছনে ছুটেছেন। কে যেন তার কানে এসে বলেছিল—বেলা যে পড়ে এলো ঘোড়দৌড়ের শেষবিন্দুর কাছাকাছি এলে, সওয়ার যেমন ঘোড়ার ওপর লেপটে শুয়ে বাজী মারার জন্য ঘোড়া ছোটায়, ঠিক তেমনি বিগত দশটি বছর ভীষণ কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়েছেন নলিনীবাবু। বেলা যে পড়ে এলো··বেলা যে পড়ে এলো। একটা রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠা তাকে নিরন্তর তাড়না করছে। নেই সময় নেই···সময় নেই।

নলিনীবাবুর বয়স আজ ষাট বছর পূর্ণ হল। তার দেহ এখনো শক্তসমর্থ। তিনি কানে পরিষ্কার শোনেন, চশমা দিয়ে লেখাপড়া করতে হলেও, খালি চোখে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পান। দাঁত দিয়ে মাছের মুড়ো কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেতে পারেন, মাটি কুপিয়ে শাক-সবজি করতে পারেন, এমনকি অনেকদূর পায়ে হেঁটেও তার হাঁফ ধরে না।

এখন, এই মুহূর্তে, নিস্তব্ধ নির্জনতায় হঠাৎ নলিনীবাবু আবিষ্কার করলেন যে, তিনি জীবনব্যাপী পণ্ডশ্রম করেছেন। অর্থাৎ তিনি কোন কাজ না করলেও যেন পৃথিবীর কোন ক্ষতি হতো না। হাওয়া ওঠে, ময়দানে ঝরাপাতা ধুলো ওড়ে। নলিনীবাবুর খোলা-কপাট বুকে এক অপরিমেয় শূন্যতা হা হা শব্দে ঢুকে পড়ে। তার কিছু ভালো লাগে না। তিনি ভাবতে চেষ্টা করেন, আর কত বছর তিনি বাঁচবেন। আরো কত বছর। আজকালকার মানুষের পরমায়ুর সঠিক পরিসংখ্যান তার জানা নেই। প্রতিনিয়ত লোকজন মরছে, জন্মাচ্ছে আর মরছে। কে তার হিসাব রাখছে! শুধু মহাপুরুষদের মৃত্যুর খবর খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়। নলিনীবাবু

কয়েকজন সম্প্রতিমৃত মহামানবের আয়ুর একটা হিসাব বের করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেন যেন তিনি মনঃসংযোগ করতে পারলেন না। তবুও নিশ্চিত হলেন যে আজকাল লোকজন পঁচাত্তর থেকে আশি বছরের মধ্যে সাধারণত মারা যাচ্ছে। আয়ুর গড় হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে, শিশু-মৃত্যুর হার কমছে। সুতরাং ন্যূনপক্ষে তিনি আরও দশবছর বাঁচবেন, এটা একরকম ধরে নিতে হল। আগামী দশ বছর কিভাবে কাটাবেন একথা ভাবতে তার শীতবোধ হল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকালেন, বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো পুরাতন ঘড়িটা সময় দিয়ে চলেছে—রাত দশটা। তবু তিনি ওঠার জন্য কোন ব্যস্ততা বোধ করলেন না। বস্তুত তার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। রাত গাঢ় হয়ে আসায় কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। চারদিকে চরাচরে জমাটবাঁধা কুয়াশা, দুধ জাল দিলে যেমন সর পড়ে তেমনি। কেমন যেন আরামের শিরশিরানি। দূরের আলোগুলোকে কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে। নলিনীবাবুর মনে হল, শান্তি বস্তুটা বোধহয় এমনি অনুভবের। যা এখন তিনি সারা দেহমন দিয়ে স্নায়ু দিয়ে উপভোগ করছেন।

একসময় ফাঁকা বাসে বসে ঝিমুতে ঝিমুতে তিনি পাড়ায় পৌঁছে গেলেন শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাড়া তখন প্রায় নিঝুম। গেট খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। গেটের ওপরে ফোটা বোগেনভিলিয়া, পাতাবাহারের সারিটুকু পেরিয়ে গেলেই বারান্দা। বারান্দায় আলো জ্বলছে। ভিতরে কোন সাড়া নেই। সবাই ঘুমুচ্ছে। কেউ জেগে নেই নলিনীবাবুর জন্য। তিনি কাকে ডাকবেন স্থির করতে পারলেন না। বাড়ির ভিতরে যারা ঘুমুচ্ছে তাদের যেন চেনেন না নলিনীবাবু। তিনি যেন এক আগন্তুক। অথচ এরা সবাই তার আপনজন। বারান্দার বামদিকের ঘরটায় তার বড় ছেলে বৌ, ডানদিকের ঘরটায় মেয়ে আর যে মেয়েটা কাজ করে সে এবং বারান্দার সামনে ড্রইংরুম পেরিয়ে গেলে যে ঘর সেখানে মেহগিনির খাটে তার স্ত্রী হেম শুয়ে আছে। চোখ বুঁজে এসব নলিনীবাবু বলে দিতে পারেন। অথচ এদের কাউকে জানাতে তিনি সংকোচ বোধ করলেন। ড্রইংরুমের দরজার ওপরে কলিংবেলের সুইচটা আছে। সুইচে চাপ দিলে বেল্‌টা আর্তনাদের মতো আওয়াজ করে সাধারণত বাড়ির কেউ বেল্‌ বাজায় না, সেটা বহিরাগতদের জন্যই নির্দিষ্ট। নলিনীবাবু হঠাৎ সজোরে বেল্‌ চেপে ধরলেন।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে হেম দিশেহারার মতো এসে দরজা খুললেন। বললেন—ওমা, এত রাত অবধি কোথায় ছিলে? হেম নিদ্রাজড়িত চোখে নলিনীবাবুকে খেতে দিলেন। নলিনীবাবু চুপচাপ খাওয়া শেষ করলেন। হেম শোবার ঘরে এসে মুখে পান গুঁজলেন। হঠাৎ স্বামীর দিকে তাকিয়ে যেন চমকে উঠলেন—কি হয়েছে তোমার বলত, চোখমুখ অমন শুকনো কেন? তারপর ডানপিটে ছেলেকে মায়েরা যেভাবে দেখে তেমনি দুহাত দিয়ে স্বামীর মুখটাকে ধরলেন। কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন। হেমের খসখসে হাতের স্পর্শে নলিনীবাবুর দারুণ অস্বস্তি বোধ হল।

শোবার পরেও নলিনীবাবুর ঘুম এলো না। হেম নিদ্রাজড়িত গলাতেই জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ফেয়ারওয়েল হয়নি? নলিনীবাবু জবাব দিলেন না, দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। কোন জবাব না পেয়েও হেম আবার বললেন—ধুতি-চাদর শাল দেয়নি? হেম যেন স্বপ্নের মধ্যে ডুবে ডুবে ধুতি-চাদর, শাল খুজছিলেন; স্ত্রীর নাকডাকার আওয়াজ শুনতে শুনতে একসময় নলিনীবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

নলিনীবাবু দেখলেন, স্ত্রীর একটা ভারি হাত তার বুকের ওপর চেপে আছে, সন্তর্পণে হাতটা সরিয়ে দিলেন। একসময় স্ত্রীর সামান্য স্পর্শ পেলেও তিনি কেমন পুলকিত হতেন। অথচ এখন সেসব কল্পনাতেও দারুণ খারাপ লাগল তার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কিছুতেই না। নানা চিন্তা ভিতরে তোলপাড় করছিল।

কাল সকাল থেকে নলিনীবাবুর কোন নির্দ্ধারিত কাজ নেই। জগদীশবাবু বলেছেন—গীতা পাঠ করবেন। মনের প্রসারতা বাড়বে। অনাদিবাবু বলেছেন—মর্ণিং ওয়াক করবেন, বডি ফিট থাকবে। বিনয় বলেছে দাদা, সকালে আখের গুড় দিয়ে কাঁচা হলুদ খাবেন। হরিপদ বলেছে—একটু ফ্রি-হ্যাণ্ড-এক্সারসাইজ করবেন।

নলিনীবাবু সমস্ত শরীরে অসহ্য বেদনা বোধ করছিলেন। সেই যন্ত্রণার মধ্যে ডুবে যেতে যেতে তিনি যেন বারবার ঘুরে ফিরে জগদীশবাবু, অনাদিবাবু এদের দেখছিলেন। তাদের উপদেশ যেন আদেশের সুরে দৈববাণীর মতো বাজছিল—গীতা পাঠ করবেন। মর্ণিং ওয়াক করবেন। কাঁচা হলুদ খাবেন।

এক্সারসাইজ করবেন। নলিনীবাবু যেন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন। না, না কিন্তু তার গলা থেকে কোন শব্দ বের হচ্ছিল না।

গাছপালা উথালপাতাল করে যেমন ঝড় আসে, তেমনি সারা শরীর কাঁপিয়ে তার জ্বর এলো। নলিনীবাবু মনে মনে ভাবলেন—ভালই হল, এতদিন কাজের ঘোরে ছিলাম, এখন জ্বরের ঘোরে থাকি। তার নিজেকে ভয়ানক নিঃসঙ্গ, অসহায় মনে হলো।

একদিন জ্বরে আচ্ছন্ন থাকার পর দ্বিতীয় দিন সকালে এক ছটফটে ছোকরা ডাক্তার এলো। মুখ গম্ভীর করে বুকে স্টেথস্‌কোপ্‌ চেপে বলল— আপনিত ভালোই আছেন। এত ভাবছেন কি? আপনি ত সুখী লোক।

আপনি ত সুখী লোক—ডাক্তারের কথাটা বারবার নলিনীবাবুর কানে বাজল। তুমি সুখের কি বোঝ হে ছোকরা? সত্যিই ত নলিনীবাবু সুখী। ডাক্তারের এক ডোজ লাল মিকশ্চার আর এক পুরিয়া পাউডার খেয়ে তার নিজেকে সুখী সুখী মনে হল। তবু তিনি রোগশয্যায় শুয়ে নিজের সঙ্গে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। যথার্থ তিনি সুখী কি না।

নিশ্চয়ই সুখী নলিনীবাবু। নিজে পনের শ' টাকা মাইনেতে রিটায়ার করেছেন। এখন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্রাচুয়িটী ইত্যাদি মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পাবেন। বড় ছেলে একটা আমেরিকান কোম্পানীতে কাজ করে, মাসে এগার শ' টাকা মাইনে পায়। বড় ছেলের বৌ সেই কোম্পানীতে কাজ করে, বড় ছেলের চেয়ে বেশী মাইনে পায়। ছোট ছেলে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এম ই. এস. এ. ঢুকেছে। সাতশ টাকা মাইনেতে। একমাত্র মেয়ে এবার এম. এ. দিয়েছে। স্ত্রী বেশ শক্ত সমর্থ। অসুখ বিসুখ নেই। মাঝে মধ্যে জ্বর সর্দি মাথাধরা কার না হয়। হেম এখনো সকালে গিয়ে রান্নাঘরে ঢোকেন, রাঁধতে রাঁধতে বেলা বাড়ে।

সাজগোজ করে কপালে সিন্দুরের টিপ পরলে হেমকে এখনো সুন্দরী মনে হয়, মেয়ে অমিতার বড় বোন বলে অপরিচিতদের ভ্রম হয়। নিজের সুন্দরী বৌ-এর জন্য এককালে নলিনীবাবুর খুব গর্ব ছিল। তাঁর ছেলেমেয়েরাও দেখতে সুন্দর। সেজন্য গর্ব ছিল। ছেলে মেয়ে সকলে লেখাপড়ায় ভালো ছিল। সেজন্যও গর্ব ছিল। এমনি অনেক অকিঞ্চিৎকর কারণে তার মনে গর্ব জন্মে ছিল। এখন, এই মূহূর্তে, যা নিদারুণ তুচ্ছ বলে মনে হয়। বৃষ্টিতে ধুয়ে

গেলে পৃথিবী যেমন পবিত্র হয়, তেমনি সব গর্ব ধুয়ে মুছে গিয়ে তাঁর নিজেকে পবিত্র পবিত্র মনে হল।

এবার তিনি তার নিজের দুঃখের সন্ধান নিতে চাইলেন। বস্তুত তার কী কী দুঃখ আছে। বড় ছেলে অশোক নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। বৌমা উষা বাঙালী নয়, পাঞ্জাবের মেয়ে। প্রথম স্বামীকে ছেড়ে অশোককে আবার বিয়ে করেছে। উষা এখন সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর লেপটে স্বামীর স্কুটারের পেছনে বসে অফিসে যায়, ফিরে আসে। শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। অন্তত নলিনীবাবু ছেলে বৌয়ের কোন দোষ খুঁজে পান না। উষা আজকাল লক্ষ্মী পূজো পর্যন্ত করে। অশোকের বিয়ে নিয়ে একসময়ে সংসারে খুব অশান্তি ছিল। বিশেষ করে হেম এ বিয়ে অনেকদিন স্বীকার করেননি। নলিনীবাবুও এ বিয়ে পছন্দ করেননি। তবু কখনও এর জন্য প্রবল বেদনা বোধ করেননি।

একমাত্র মেয়ে অমিতা, সেও বাপ-মায়ের পচ্ছন্দ করা কোন ছেলেকে বিয়ে করবে না, একথা নলিনীবাবু জানেন। কেননা অমিতার একজন ঢ্যাংগা মতো প্রেমিক আছে। এর জন্যও কী নলিনীবাবুর দুঃখ আছে! তিনি মনের গহীনে ডুব দিয়ে দুঃখ ধরার চেষ্টা করেন। তার কী কী দুঃখ আছে। দুঃখ, দুঃখ। অনেক ভেবে দেখলেন, নলিনীবাবুর মনে একটা ছোট্ট দুঃখ আছে। হাঁ, হেম এখনো হিন্দি সিনেমা দেখেন, এটা তিনি পছন্দ করেন না। এটাকে তেমন জোরালো দুঃখ মনে হচ্ছে না। ছোটবেলা নলিনীবাবুর একজন প্রেয়সী ছিল, পুতুল খেলার বয়সের সঙ্গিনী। নলিনীবাবু নিজে বিয়ে করার অনেকদিন পর আচমকা একদিন ভাবলেন, সেই মালতীর সঙ্গে তার বিয়ে হলেই তিনি বুঝি সুখী হতেন। হেমের ভালবাসায় বুঝি কোথায় ঘাটতি রয়ে গেছে। এখন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সবকিছু ভেবে তিনি বিন্দুমাত্র বেদনাবোধ করেন না। কোন কিছুতেই নয়। সুখ দুঃখ সবকিছু নিতান্তই আপেক্ষিক মনে হয়।

তৃতীয়দিন পড়ন্ত বেলায় ঘাম দিয়ে নলিনীবাবুর জ্বর ছেড়ে গেল। তিনি ঘেমে নেয়ে উঠলেন; গায়ের গেঞ্জি ভিজে সপসপে হয়ে গেল। নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে হল, অবসাদ তাকে আচ্ছন্ন করল। ঘুম ভেঙে গেলে তিনি দেখলেন অমিতা গরম জলে ভেজান তোয়ালে দিয়ে তার সর্বাঙ্গ মুছে দিচ্ছে। অমিতার মুখের দিকে তাকালেন, শান্ত স্নিগ্ধ মুখখানা। মমতা মাখানো।

সন্ধ্যের আলো আঁধারিতে নলিনীবাবু বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসেছিলেন। তার মনের ভাবনাগুলো ভেসে বেড়াচ্ছিল। জমাট বাঁধছিল না। হেম এসে যেন ঝাঁকুনি দিলেন—অ্যাই, হরলিকস্ খাও। নলিনীবাবু অনেক কষ্টে হরলিকস্টুকু গলাধঃকরণ করলেন। হেম তার পাশে চেয়ার টেনে বসলেন। —হ্যাঁগো, এবার পুজোয় অমু বাড়ি এলো না কেন? জান, মানস বিলেত যাচ্ছে। আমাদের একজন ছেলেমেয়েকেও বিলেত পাঠাতে পারলে না।

স্ত্রীর অনাবশ্যক কথা শুনতে শুনতে নলিনীবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

কয়েকদিন পর আবার ডাক্তার এলো। এবার আর পাড়ার ছোকরা ডাক্তার নয়। রেডক্রশ আঁকা এমবাসেডর গাড়ী থেকে ডাক্তারবাবু নামলেন। বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। বেশ রাশভারি, গুমরো মুখো। এসেই সজোরে নলিনীবাবুর নাড়ী চেপে ধরলেন। বললেন—কী কষ্ট?

নলিনীবাবু মাথা নাড়লেন। কোন কষ্ট নেই।

—মাথা ঘোরে?

নলিনীবাবু সায় দিলেন।

—ভীষণ দুর্বল বোধ হয়?

এবারও নলিনীবাবু স্বীকার করলেন।

—আর কিছু অসুবিধা?

—না।

ডাক্তারবাবু আদেশ করলেন—চিৎ হয়ে শোন, হাঁটু ভাজ করুন, জোরে নিঃশ্বাস নিন, এবার উপুড় হোন, কাত হোন।

সবকিছু দেখে ডাক্তারবাবুর গম্ভীর মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। নলিনীবাবু সকৌতুকে ডাক্তারের দিকে তাকালেন। বললেন—কী দেখলেন ডাক্তারবাবু? ডাক্তার ঈশ্বরের মতো অভয় দিয়ে বললেন—ভালো হয়ে যাবেন। নলিনীবাবু শিশুর মতো হাসলেন। নিজে নিজে বললেন—বেশ ভালোই ত আছি।

অশোক সলজ্জভাবে একতাড়া নোট ডাক্তারবাবুর হাতে গুঁজে দিল। ডাক্তারবাবু অবহেলাভরে টাকাগুলোকে বুশসার্টের বুক পকেটে পুরে দিলেন। তারপর হনহন করে গাড়ীর দিকে চললেন। অশোকও ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। ফিরে এসে বৌকে ডাকল, অমিতাকে ডাকল। নিজেদের মধ্যে

গম্ভীরভাবে কি সব বলা কওয়া করছিল। হেম এসে জিজ্ঞাসা করলেন— ডাক্তারবাবু কি বললেন? অশোক ও অমিতা একে অপরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। অমিতা বলল—বলেছেন ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু হেম বিশ্বাস করলেন না। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠলেন—তোরা আমার কাছে যেন লুকিয়ে যাচ্ছিস।

নলিনীবাবু নিজেও টের পেয়ে গেলেন যে তার কিছু বাড়াবাড়ি অসুখ হয়েছে। এবং তিনি প্রাণ-সংশয় অবস্থায় পৌছেছেন। অথচ হেম কিছুই বুঝতে পারছে না। এটা নলিনীবাবুর কাছে দারুণ মজা মনে হচ্ছে। অমিতার চোখদুটো কেমন ফোলা ফোলা। হয়ত কেঁদেছে, বাবার জন্য। হতেও পারে। সারা বাড়িটা থমথমে নিঝুম। নলিনীবাবু যেন মরেই গেছেন। ভেবে তার হাসি পেল। মৃত্যুটা যেন আশ্চর্য রকমের একটা কিছু, যা শুধু নলিনীবাবুরই আসছে। আর কারো আসবে না।

এর আগে মৃত্যু-চিন্তা কখনও করেননি নলিনীবাবু। বস্তুত অনেকেই করেন না, একটা বিশেষ বয়সের আগে। তাছাড়া অবসরও ছিল না। এখন তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, হাত বাড়ালেই মৃত্যুকে ছোঁয়া যায় পৃথিবী থেকে উচ্ছেদের পরোয়ানা দিয়ে গেছে ডাক্তার। তার বুকের নীচে লুকিয়ে পেণ্ডুলামটা দুলছে। ঝড়ো হাওয়ায় ঝাড়-লণ্ঠন যেমনি দোলে। তিনি নিজের নাড়ী ধরে গুণতে থাকেন—এক, দুই, তিন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখেন, নাড়ী যথারীতি চলছে। ছোটবেলায় তিনি শুনেছিলেন, সুস্থ মানুষের নাড়ী মিনিটে বাহাত্তর থেকে আশীবার চলে। হাতঘড়িটা এনে তিনি নাড়ীর গতি গুণতে সুরু করলেন। কখনও অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে চলছে কখনও ধীরে ধীরে, মনে হয় তিনি ঠিক গুণতে পারছেন না। বার বার ভুল হয়ে যাচ্ছে। সারা জীবনব্যাপী হিসেব মিলিয়েও তিনি ত হিসেব মেলাতে পারছেন না।

আচমকা হেম ঘরে ঢুকে পড়লে নলিনীবাবু টের পান না। গলার স্বরে চমকে ওঠেন। যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন। হেম জিজ্ঞাসা করেন—কিগো, কেমন লাগছে? নলিনীবাবুর সংক্ষিপ্ত জবাব দেন—ভালো। সত্যিই তো তার কিছু খারাপ লাগছে না।

উনি উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকান। বাগানে দুটো সূর্যমুখী ফুল

ফুটেছে। মৃদু হাওয়ায় দুলছে; কয়দিন বাদে তিনি ফোটা ফুল অথবা হাওয়ার স্পর্শ পাবেন না। একথা ভেবে মনটা কেমন বিমর্ষ হল। কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার দুঃখটাও খুব জোরালো মনে হল না। তিনি অপাঙ্গে হেমকে দেখতে লাগলেন। হেম বললেন—কী দেখছ, অমন করে?—তোমাকে। হেমের চোখে মুখে কিশোরীর মতো লজ্জা নেমে এলো, নলিনীবাবুর কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি ভালো হও। নলিনীবাবু মিটিমিটি হাসলেন, বিড়বিড় করে নিজে নিজে বললেন—আমি আর ভালো হবো না।

এখন নলিনীবাবুর চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। বুকের ভিতরে হাতুড়ির ঘা পড়ে। উনি দেওয়াল ধরে ধরে পায়খানায় যান। বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েন। একজন বহিরাগতর দৃষ্টিতে নিজের তৈরী সংসারটাকে দেখেন। পরিদর্শকের মতো সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। অশোক, ঊষা, অমিতা, হেমকে এবং বাড়ীর সামনের চলমান জনস্রোত মিলিয়ে মিশিয়ে দেখেন। পৃথিবীটা নদীর স্রোতেরই মত সচ্ছন্দ গতিতে বয়ে চলেছে। তিনি কল্পনা করেন কয়দিন বাদে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না। চোখের সামনে সূর্যমুখী ফুল ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে যাবে। মাথার ওপরে ছাত ঝাপসা হয়ে। তারপর···।

এর আগে কখনও এমন এমন একটানা ওষুধ খেতে হয়নি নলিনীবাবুকে শিয়রের পাশে ওষুধগুলো সাজান আছে। হেম এসে রীতিমত ওষুধ খাওয়ান নলিনীবাবুর ইচ্ছে হয় ওষুধগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেন। পারেন না। ভয় পান মনে হয় তিনি বন্দী আছেন। মনে মনে হাসেন, এমনি আর কতদিন আটকে রাখবে। একদিন বিছানাটা শূন্য হয়ে যাবে। সিরাপের মতো একটা মিষ্টি ওষুধ আছে। অন্যের অগোচরে সেই ওষুধটা মাঝে মাঝে খান। ওষুধের ফাইলের গায়ে লেখা ইংরেজী পড়েন। ক্যালেণ্ডারের পাতায় চোখ বোলান। তারিখ ঠিক করতে পারেন না। অমিতাকে ডাকেন, ছোটবেলাকার সেই আদুরে—রুন্টি। মেয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসে—কী বাবা? নলিনীবাবু জিজ্ঞাসা করেন—আজ কতো তারিখ?

একটা বাটিতে করে হেম খানিকটা সুজির পায়েস নিয়ে আসেন, তার সঙ্গে ফুলকো লুচি। ফুলকো লুচির সঙ্গে সুজির পায়েস খেতে নলিনীবাবুর

বিশেষ পছন্দ। এখন তাঁর কিছু ভালো লাগল না। বস্তুত কোন কিছু বিশষ পছন্দের জিনিস, এখন, এই মুহূর্তে, থাকুক, এটা তার ভালো লাগল না। হেম তবু জোর করলেন—একটু খাও। নলিনীবাবু কিছুতেই খেলেন না। হেমের চোখ ছলছল হল। তাতে আনন্দই হল নলিনীবাবুর। মনে হল, তিনি ক্রমশঃ তুচ্ছ মায়া মমতা ভালবাসা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন।

শেষ বিকেলবেলায় হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। তিনি কিছুই স্মরণ করতে পারলেন না। এই পর্যন্তই মনে হল, তিনি বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছিলেন, তার মাথার মধ্যে যেন শিরশিরানি বোধ হচ্ছিল। বুকের ভিতরে হাফরের মতো'ওঠানামা। একটু অস্থির-অস্থির ভাব। তারপর চোখ জড়িয়ে এলো তিনি ভাবছিলেন, মৃত্যু বুঝি এমনি নিঃশব্দে নিদ্রার মতো নেমে আসে। শিশিরের মতো টুপ করে পরমায়ু ঝরে পড়ে।

ধীরে ধীরে তার সংজ্ঞা ফিরে এলো। তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। আশ্চর্য হলেন, তিনি মরেননি। না কি স্বপ্ন দেখছেন। মৃত্যুর পরেও স্বপ্ন হয়? হেম তার শিয়রে বসে আছেন। মনে হল, হেম খুব কান্না করেছেন। অমিতা দাঁড়িয়েছিল। নলিনীবাবু চোখ মেলতেই, তাঁর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, বলল—তোমার কেমন লাগছে? নলিনীবাবু কোন জবাব দিলেন না। দিতে পারলেন না। তাকিয়ে দেখলেন, একটা গাছে তিনটে সূর্যমুখী। কেমন ম্রিয়মান। তেমনি মৃদু বাতাস। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সন্ধ্যা সমাগত। সবকিছু ঠিকঠাক আগেকার মতোই চলছে।

সকাল থেকেই কেমন যেন তোড়জোড়ের ভাব। একটা চঞ্চলতা। নলিনীবাবুর নিজেকে দারুণ ক্লান্ত মনে হল। তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারছিলেন না। অথচ তার স্নায়ুগুলো, অনুভূতি আবার সতেজ হয়ে উঠেছে। তীব্র হয়ে উঠেছে। কাল বিকেলে তিনি মারা যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবার পরমায়ু ফিরে পেয়েছেন। এমনিভাবে একদিন তিনি মরে যাবেন। সবাই দুদিন তার জন্য শোক করবে। তারপর ভুলে যাবে। কেননা ভুলে যাওয়াই মানুষের স্বভাব।

নলিনীবাবু বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হেম স্নান করে আসার পর

উষা স্নানঘরে ঢুকেছে। ঘরের বাতাস সুগন্ধ তেল সাবানের গন্ধে ভুরভুরে। বাতাস থেকে গন্ধ শুষে নিতে গিয়ে নলিনীবাবুর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। তিনি দেখলেন, ভিজে চুল হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে হেম তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছেন। কি ভাবছেন? নলিনীবাবু ভেবে স্থির করতে পারলেন না। হঠাৎ হেম তার বরফের মতো শীতল হাতখানা নলিনীবাবুর কপালে ঠেকালেন। নলিনীবাবুর দারুণ আরাম বোধ হল।

রান্নাঘর থেকে মাছ ভাজার গন্ধ আসছে। শুয়ে শুয়ে নলিনীবাবুর তার বাবার মৃত্যুর দিনের কথা মনে হল। সেদিনও এমনি চনচনে রোদ্দুর, এমনি ঝলমলে সকাল। সেদিনও সকাল থেকে এমনি রান্নার তোড়জোড় পড়ে গিয়েছিল। বাবা মারা গেলে কারও খাওয়া হবে না। তাই সকলে খেয়ে নিচ্ছিল। জ্যেঠাইমা ডেকে নিয়ে নলিনীবাবুকে চারটে খাইয়ে দিয়েছিল। অন্য ভাইবোনেরা কেউ খায়নি। নলিনীবাবু কি আজকেই মারা যাবেন! তিনি নিজে ভাবছিলেন মারা যেতে পারেনও বা। দমকলের পাগলাঘন্টির মতো বুকের মণিকোঠায় দোলান ঘণ্টা বেজে উঠলেই মানুষ মারা যায়।

অশোক এসে বলল—বাবা, তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। নলিনীবাবু মৃদু বিরক্তি প্রকাশ করলেন—আবার ডাক্তার কেন? তার নিজেকে খুব অসহায় মনে হল। এখন ছেলে, ছেলেবৌ-এর কথামতোই তাকে চলতে হবে। প্রতিবাদ করা বৃথা। অথচ তার ইচ্ছে ছিল, তিনি চুপচাপ শুয়ে সূর্যমুখী দেখেন।

ওরা যেন কোন নিমন্ত্রণে যাচ্ছে অথবা পিকনিকে। নলিনীবাবুর তেমনি মনে হল। উষা এবং অমিতা তাকে পাঁজা করে ধরে গাড়ীতে বসাল। গাড়ীটা অমিতার ঢ্যাংগা মতো সেই পুরুষ বন্ধুটির। সেই গাড়ী চালাচ্ছে। তার পাশে আটোসাঁটো বুশসার্ট পরা অশোক। গাড়ীর ভিতরেও উষা ও অমিতা দুজন দুদিকে বসে নলিনীবাবুকে বেষ্টন করে রেখেছে। অমিতা চাপা রংয়ের একটা টেরিকটের শাড়ী পরেছে তার সঙ্গে একই কাপড়ের ব্লাউজ। কপালের টিপটা দিতেও ভোলেনি। উষা গাঢ় টিয়া রং-এর একটা শাড়ী পরেছে এবং একই রং-এর ব্লাউজ্। ঠোঁটে জাফরানী রং-এর লিপষ্টিক। গাঢ় রং-এর পোষাকে টকটকে ফর্সা উষাকে মানায় ভালো। নলিনীবাবু সরল শিশুর মত ওদের ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে দেখছিলেন। ওদের প্রসাধনের গন্ধে তিনি

যেন ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। কার ফুলের মতো ফোটা সংসার। তার বুকের মধ্যে আবার দমকলের পাগলাঘন্টি বাজছিল। তিনি দু'হাত দিয়ে অমিতা ও উষাকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। ওরা দুজন একটু আলগা হয়ে বসল। সামনের সীট থেকে অশোক ও অমিতার বন্ধু পেছন ফিরে তাকাল। নলিনীবাবুর কপালে মুক্তোবিন্দুর মতো ঘাম জমল।

জানা গেল, ডাক্তার অমিতার বন্ধু নীরেনের আত্মীয় হন। বিরাট বাড়ী সাহেব পাড়ায়। ঝকঝকে মোজেকের মেঝে। ওরা একটা বিরাট হলঘরে বসল। লম্বা লম্বা সোফা সেট, দেওয়াল জুড়ে নানা ছবি। অধিকাংশ গ্রুপ ফটো। ভারতের, বিদেশের। ওষুধ কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার। নলিনীবাবু সোফায় হেলান দিয়ে সব দেখছিলেন। অশোক টেবিলে রাখা ইংরেজী ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। অন্যরা চুপচাপ বসেছিল।

নাটকের কোন বিশেষ দৃশ্যে অভিনেতা যেমন প্রবেশ করেন, তেমনি ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। বেঁটেখাটো লোকটা। অনেক বয়স। গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। কাশফুলের মতো সাদা চুল। ভ্রূ জোড়াও সাদা। খাকী রং-এর হাফ প্যাণ্ট পরণে ছিল, গায়ে সাদা গেঞ্জী। ডাক্তারকে ভীষণ ছটফটে এবং হাসি খুশী মনে হল। ডাক্তারকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। তিনি বললেন—থাক থাক বস।

ডাক্তার নলিনীবাবুর সামনে রাখা মোড়ার ওপর বসলেন। চিরাচরিত ডাক্তারী কায়দায় বললেন—কি কষ্ট?

নলিনীবাবু স্তিমিত কণ্ঠে বললেন—কোন কষ্ট নেই।

ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে নলিনীবাবুর দিকে তাকালেন—কোন কষ্ট নেই? আবার বললেন—কোন কষ্ট নেই? অনিদ্রা, খাওয়ার অনিচ্ছা, জ্বর, শ্বাসকষ্ট? অন্য কোন কষ্ট?

নলিনীবাবু বললেন—হ্যাঁ, শ্বাসকষ্ট হয় মাঝে মাঝে।

ডাক্তারের মুখে হাসি উঁকি দিল, তিনি যেন আশ্বস্ত হলেন—তাই বলুন, কষ্ট আছে। থাকতেই হবে। বুকে পিঠে স্টেথিসকোপ বসালেন, নাড়ী দেখলেন, চোখের পল্লব টেনে ভিতরটা দেখে গম্ভীর মুখ করে আগেকার প্রেসক্রিপসনগুলো দেখলেন, এর আগে কি কি ওষুধ খাওয়ান হয়েছে। নলিনীবাবু সোফায় হেলান দিয়ে ডাক্তারকে দেখছিলেন। ডাক্তারকে

কেমন পাগলাটে পাগলাটে মনে হচ্ছিল। শিশুর সারল্য যেন ওর মুখে খেলা করছে।

ডাক্তারবাবু হঠাৎ উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—রাবিশ, অল রাবিশ। সকলেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ডাক্তারের মুখে উত্তেজনা উছলে উঠেছে। তিনি বললেন—কিস্সু হয়নি। আপনার কিস্সু হয়নি। উষা, অমিতা, অশোক এবং নীরেন সকলে ডাক্তারের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। নলিনীবাবু যেন আঁতকে উঠলেন—কিছু হয়নি? আমি বাঁচব? ডাক্তার সকৌতুকে মিটিমিটি হাসলেন—আলবাত্ বাঁচবেন, এখনো দীর্ঘদিন।

নলিনীবাবুর মধ্যে যেন ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি আরও অনেকদিন বাঁচবেন! অনেকদিন! হিতৈষীদের উপদেশ তার কানে বাজছিল—গীতা পাঠ করবেন। মর্ণিং ওয়াক করবেন। কাঁচা হলুদ খাবেন। এক্সারসাইজ করবেন। তার দুচোখ গড়িয়ে বৃষ্টিধারার মতো অশ্রু ঝরছিল। অমিতা ওর আঁচল দিয়ে নলিনীবাবুর চোখ মুছিয়ে দিচ্ছিল। উষাও নলিনীবাবুর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। তিনি ওদের প্রসাধনের গন্ধ পাচ্ছিলেন। পৃথিবীর লোভ-লালসা, আশা-আকাঙ্ক্ষার গন্ধ তার চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছিল। অশোকের গলা শুনতে পেলেন—বাবা, তুমি ভালো হয়ে যাবে, সুস্থ হয়ে উঠবে।

তিনি ওদের কিছু বোঝাতে পারছিলেন না। এতদিন মৃত্যুর মধ্যে আচ্ছন্ন থেকে, মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে, আবার কি করে নতুনভাবে জীবন সুরু করবেন। ওরা কেউ বুঝল না, নলিনীবাবু আবার বেঁচে উঠতে চান না।

ভুলেন্দ্রর দুই দরজা

প্রভাস ভদ্র

বাস থেকে নেমে ভুলেন্দ্রর খেয়াল হ'ল, আজ নির্ধারিত লোড-শেডিং-এর দিন। সে আজ অপ্রত্যাশিতভাবে বাসে বসার সীট পেয়েছিল। সাধারণতঃ বসতে পারলেই আলস্যে তার ঝিমুনি আসে। সেহেতু এতক্ষণ বাসে বসে ঝিমোচ্ছিল। সুতরাং চারদিকের গাঢ় অন্ধকারটা মালুম হয়নি। এখন হ'ল।

সে মুদীদোকান থেকে মুড়ি নিল। সঙ্গে একটা দাঁতের মাজন আর কাপড়কাচা সাবান। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় টাকা পয়সা গুণে খুচরো কিছু কমতি দেখতে পেল। কিন্তু নতুন করে আরেকটা টাকা ভাঙাতে ইচ্ছে হ'ল না। ফলত ঠোঙাটা ফিরিয়ে দিয়ে ঘাটতি পয়সা পরিমাণ মুড়ি কম দিতে বলল।

শেষ বর্ষায় পাড়ার রাস্তায় এখনো জমে থাকা ইতস্তত জল কাদা। তদুপরি ছোট গর্ত এবং জমাট অন্ধকার। সে কাঁধের ঝুলন্ত ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে জ্বালল। তেমন যুতসই আলো হ'ল না। অর্থাৎ ব্যাটারী বাড়ন্ত। মাসের শেষে এখন নতুন ব্যাটারী কেনার কথা ভাবনার বাইরে। সুতরাং আপাতত ব্যাটারী—ফুরন্ত টর্চের ম্লান আলোতে প্রখর দৃষ্টি ছড়িয়ে রাস্তার দূরত্ব কমাতে থাকল।

বাসায় ফিরে জলন্ত টর্চ বগলবন্দী করে তালা খুলল এবং সেদিনকার কিনে আনা মোমের শেষাংশটুকু খুঁজে বের করল। জ্বালাল। ভাবল, একটা মোম কিনে এনে রাখা একান্ত দরকার। কিন্তু শরীর জুড়ে সমস্ত দিনের ঘাম জবজবে গেঞ্জী জামা, ক্লান্তি এবং অবসাদ। রাস্তার যা হাল, সেই সঙ্গে টর্চের ব্যাটারী ফুরন্ত। এসব কারণে আবার রাস্তায় বেরিয়ে মোম কিনে আনতে ইচ্ছে হ'ল না।

সে একে একে জামা কাপড়গুলো খুলল। একমাত্র আণ্ডারওয়ার পরে কুয়োতলায় গিয়ে আওয়াজ তুলে জল কুলকুচো করল। হাতমুখ ধুয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিল। তারপর বাথরুম থেকে ফিরে গামছায় জল মুছে ভবে কিছুটা

আরামবোধ করল। কিন্তু পরক্ষণেই ঘরময় অসহ্য গুমোট গরম লাগতে খেয়াল হ'ল, বন্ধ জানলাগুলো খোলা হয়নি। একে একে জানলার কপাটগুলো খুলে দিতে নর্দমার পাশ থেকে মিনি নামে পোষা বেড়ালটা মিউ মিউ আওয়াজ তুলল। একলাফে জানলা টপকে ঘরে ঢুকলো। তারপর কাছে এসে তার বে-আব্রু পা দু'টোয় লোমশ গা ঘষে ঘষে ঘুরতে থাকল। সেই সঙ্গে মুখে মিউ শব্দ।

মিনির এসব পরিচিত আওয়াজ আচরণের প্রকৃত অর্থ সে জানে। সেইমতে তার খেয়াল হ'ল, অনেক সকালে সে আজ আউটডোর হাসপাতালে বেরিয়েছে। ওখান থেকে সোজা অফিস। ফিরছে এই রাত্তিরে। সুতরাং আজ সমস্ত দিন নির্ঘাৎ মিনির কিছু খাওয়া হয়নি। মিনি এখনই কিছু খেতে চাইছে। এই এক আশ্চর্য জীব। একবার পোষ মেনে গেলে না খেয়ে ভুখা থাকবে তবু ঘর ছেড়ে অন্যত্র খাবার জোগাড়ে যাবে না।

এসব ভাবতে ভাবতে ঠোঙা থেকে মুঠোয় ভরে কিছুটা মুড়ি মেঝেয় ছড়িয়ে দিতে মিনি জিবের ডগায় মৃদু শব্দ তুলে খেতে থাকল. ঠোঙার বাকি মুড়িগুলো সে একটা এনামেলের বাটিতে ঢেলে নিল। দেওয়ালের তাকে একটা কলা ছিল। একটু চিনি দরকার, অথচ চিনির কৌটো শূন্য। তবে কী করা যায়। অনেকদিন আগে গ্রাম থেকে মিনুমাসী লোক-হাতে কিছু নারকেল নাড়ু পাঠিয়েছিলেন। পাশের ভাড়াটে ঘরের রন্তু নামে ছোট্ট ছেলেটা একদিন তার ছুটে আসা খেলার বল কুড়োতে এসেছিল। ভারী মিষ্টি চেহারা ছেলেটার। চোখ দুটো নীলাভ সমুদ্রের মত উজ্জ্বল এবং নির্মল। সে আদর করে রন্তুকে কয়েকটা নাড়ু দিয়েছিল। সেই থেকে খেলার ছলে ছেলেটা রোজ সকালে আসত। সে তাকে আদর করত। গল্প টল্প করত। হাজারো বেখাপ্পা প্রশ্নের জবাব দিত; এবং তার হাতে নাড়ু দিত। পরের দিকে এমন হয়ে গিয়েছিল যে বেশি দেরী দেখলে রন্তু অধৈর্য হয়ে কৌটোটার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করত, এখনো দিচ্ছো না কেন?

—কী?

—নাড়ু। তাকে কাজে ব্যস্ত দেখলে রন্তু অনুমতি চাইত, আমি হাত দিয়ে নোব?

—নাও। তবে বেশি না কিন্তু।

আজ এই মুহূর্তে নাড়ুর কথা মনে পড়তে সে কৌটোটা ঝাঁকালো। কোন আওয়াজ না হওয়ায় খেয়াল হল, রত্ন কয়েকদিন হল আর আসে না।

মিনি তার খাওয়া শেষ করে মসৃণ মেঝে চাটতে চাটতে একসময় উর্ধ্বমুখে জুল জুল চোখ চেয়ে তাকাল। দারুণ জলন্ত দু'টো চোখ। মোমের ম্লান আলোয় ভয়ঙ্কর দেখতে। সে আবার কিছুটা মুড়ি ছড়িয়ে দিয়ে নিজেও খেতে থাকল। শুকনো মুড়ি। সঙ্গে নবাবের হাতে ফুটন্ত গোলাপের মত খোসা ছাড়ানো বৃন্তে আঁটা কলা। কুটুস কুটুস কামড়ে ছোট্ট টুকরোগুলো জিবে টেনে নেয়া—কী ভীষণ কৃপণতা। তবু কলাটা শেষ পর্যন্ত মুড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমতালে ছুটতে পারে না। অনেক আগেই ফুরিয়ে গেল। মিনি আবার মেঝে চাটতে চাটতে উর্ধ্বমুখে চোখ তুলে তাকাল। সে তাই বাকি মুড়িগুলো মিনিকে মেঝেয় ছড়িয়ে দিল।

কুজোর জলটায় কেমন যেন দুর্গন্ধ। তার খেয়াল হ'ল, আজ সকালে প্রতিদিনকার মত খাবার জল তোলা হয়নি। একে বাসি জল তায় আবার তলানিটুকু। সুতরাং দুর্গন্ধ স্বাভাবিক। তবু ঢক ঢক জল খেল। তৃপ্তির আওয়াজ তুললো। সিগারেট ধরাতে গিয়ে ডাক্তারের নির্দেশ মনে পড়ল—চা সিগারেট খাবেন না। তেল ঝাল মশলা খুব কম। রোগটা লিভারের। সুতরাং, সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাবার খাবেন। সেই সঙ্গে বিশ্রাম একান্ত দরকার। সে সিগারেট খেল না। সিগারেটটা আঙুলের চাপে দুমড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এখনো তক্তপোষের ওপর পাশাপাশি সাজানো দু'প্রস্থ মাথার বালিশ। দু'টো পাশ বালিশ। অথচ, মানুষ বলতে সে একা। এমনিতেই ছোট্ট ঘর। যেটুকু সামান্য আসবাবপত্র আছে তাতে ঘরটা আরো বেশিরকম ছোট মনে হয়। তবু মনে হ'ল, এতবড় ঘরে সে আজ বড় নিঃসঙ্গ-একা।

শোবার জোগাড়ে সে কাঁধের গামছা দিয়ে অগোছালো বিছানা ঝেড়ে দু'হাতের তালুতে ফেলে বালিশগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুললো ; এবং আয়েস করে গা এলিয়ে দিল। যা ! মোমটা শেষ। চোখ ফিরিয়ে দেখল, কৌটোর ঢাকনায় গড়ানো তরল মোমে ডুবন্ত শেষ সলতেটুকু পটপট শব্দ তুলে জলছে। জলতে জলতে এক সময় নিভে গেল।

অতএব ঘরময় গাঢ় জমাট অন্ধকার। গুমোট গরম। ভ্যাপ্‌সা গন্ধ।

বিছানাটা বোধহয় ঠিকমত ঝাড়া হয়নি। কিংবা দীর্ঘদিনের অপরিচ্ছন্নতার জন্য সমস্ত শরীরময় কুটকুট চুলকাচ্ছে। মিনিটা গেল কোথায়! ওর কোন সাড়া শব্দই আর পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো ধারে কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে। ঘরের কোন কিছুই আর নজরে আসছে না। এমনকি নিজেকেও আর দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত আদুর গায় হাত বোলাতে বোলাতে খেয়াল হল, এখন তার শরীরে বস্ত্র বলতে শুধুমাত্র আণ্ডারওয়্যারটা। সেটাও দেখা যায় না। এটাকেও অনায়াসে খুলে ফেলা যেতে পারে। কেইবা আর দেখছে। এমনকি নিজেও কিছু দেখতে পারবে না। সুতরাং সে নগ্ন হয়ে গেল।

এরকম আচরণ তার জীবনে এই প্রথম। এটাকে কী বলা চলে—মনো-বিকার? সে কোন উত্তর খুঁজে পেল না। খুব একটা মাথাও ঘামালো না। বরং এভাবে অন্ধকারে নগ্ন হয়ে বেশ ভাল লাগল। ভীষণ হাল্কা এবং পবিত্র পবিত্র মনে হল। জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত বহুবিধ তত্ত্বকথা মনে এসে গল জাগতিক কৃত্রিমতার উর্ধ্বে সে এক আনন্দময় শুচিসুন্দর শূন্যলোকে বিচরণ করতে থাকল। একসময় বিক্ষিপ্ত ভাবনা চিন্তার গভীরে তলিয়ে যেতে যেতে কেবলই স্ত্রী চৈতি-স্মৃতি ভেসে এলো। মনের ভিতর এক ধরণের তীক্ষ্ণ চঞ্চলতা অনুভব করল। চৈতি-সম্পর্কিত টুকরো টুকরো স্মৃতির পাতা উল্টাতে উল্টাতে ক্লান্ত বিষণ্ণ এবং নিঃসঙ্গ বোধ করল।

তার জীবনে নিঃসঙ্গতা নতুন কিছু নয়। কৈশোরে পিতৃহীন। দারিদ্র্য-জনিত কারণে গ্রাম গৃহ মাকে ঝেড়ে কোন এক হিতৈষীর ঘরে মানুষ হওয়া। যৌবনে টিউশানি করে কলেজে পড়া। তারপর মেসে থেকে চাকরি। বাসাভাড়া করে মাকে আনা। একটু বেশি বয়সেই চৈতিকে বিয়ে করা। তখন মোটামুটি একটা স্বল্প সুখের জীবন। চৈতি ঘরের বাইরে দু'দণ্ড পা ফেলত না। কস্মিন কালেও কোথাও একা বেড়াতে যেত না। সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকত। সেজন্য কখনো-সখনো তার মনে হত' ব্যাপারটা কেমন যেন স্বামীকে পাহারা দেবার মত। বুঝিবা কেমন অবিশ্বাসও—এমনতর ভাবনা মাঝে মধ্যে মনে উঁকি দিলেও সমস্ত ব্যাপারটায় চৈতির গভীর প্রেম জড়িত আছে মনে করে সে তেমন আমল দেয় নি। তার ধারণা, এসব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বেশি ভাবলেই সংসারে অশান্তি এবং কুটিলতা আসে। সুতরাং সে আজকেই

কিছু না ভাবার চেষ্টা করত। অথচ কেন যে এমন হয়ে গেল! মা মারা যাবার দু' মাস না যেতেই যখন অফিসে লাগাতার ধর্মঘট চলছিল তখন তার নিত্যদিনের প্রতি মুহূর্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চৈতি চলে গেল।

চলে যাওয়া অর্থে অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া। চৈতি কোথায় কার সঙ্গে এখন গোপনে ঘর করছে তা সে জানে। জেনেশুনেও নির্বিকার। কেননা, স্ত্রী পালিয়ে যাওয়া যে কোন পুরুষের পক্ষেই অন্তহীন লজ্জা। তাছাড়া, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তার বিশ্বাস, চৈতি আসবে। নিশ্চিত হঠাৎ কোন একদিন ফিরে আসবে। নিজের অপরাধ স্বীকার করবে। ক্ষমা প্রার্থনার লজ্জা-ম্লান মুখটা তার বুকের ভাঁজে লুকাবে। সে চৈতির চুলে ঠোঁট ছোঁয়াবে। আঙুলের আঁচড় কাটবে। চৈতি তার বুকের লোমে নাকের ডগা ঘষবে; আলতো হাত বোলাবে। কিছু মান অভিমান রোদ জল ঝড় বৃষ্টি ভালবাসার খেলা চলবে; এবং তারপর যথারীতি আগেকার মত সব ঠিকঠাক আকাশ হয়ে যাবে।

প্রতি পদক্ষেপে তার যে কত কষ্ট তার নাড়িনক্ষত্র চৈতির নখদর্পণে। অথচ; সে কিছুতেই ভেবে কূলকিনারা পায় না—চৈতি কেন যে তার টাকা পয়সার অভাব নিয়ে বড় বেশি বিরক্ত করত। সে প্রায়শই বলত, তুমি কেন যে বোঝ না, দিতে পারাতেই যত আনন্দসুখ। দিয়ে সে আনন্দ সুখ কেইবা আর পেতে না চায়। আজন্ম সংগ্রামী জীবনে আমার সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। হাসিমুখে থাকার অর্থ সুখ নয়। সুখ এবং শান্তি ভিন্নতর। আমি শান্তি প্রত্যাশী। জানি, তোমার জীবনেও অনেক কষ্ট। আমারও। দু' জনের কষ্ট মিলে একবিন্দু শান্তির জন্য এসো না দু'জনে চেষ্টা চালিয়ে যাই।

চৈতি কোন জবাব দিত না। একরাশ ভারী মেঘ-মুখ নিয়ে নিশ্চুপ থাকত সে। সে আরো অনেক অনেক প্রশ্ন করত। চৈতির কাছ থেকে উত্তরের প্রত্যাশায় থেকে থেকে সে ব্যর্থ হত। এক সময় নৈরাশ্যে ডুবে গিয়ে অবিরাম যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকত।

চৈতি চলে যাবার পর প্রথম দিকে সে প্রায়শই ভাবত, চৈতি নিশ্চিত অফিসে ফোন করবে। পাশের টেবিলে বড়বাবুর সামনে তার জন্য কোনদিন ফোন বেজে উঠলেই উৎকণ্ঠিত কান পেতে মনে করত, বোধহয় চৈতির ফোন এল। সে যে কী জমজমাট উত্তেজনা। শরীর মন জুড়ে শিহরণ। অথচ

এখনো বুকের কোণে গোপন কাঁটা ক্ষোভ যন্ত্রণা—ওপার থেকে চৈতির কণ্ঠস্বর একদিনও ভেসে এলো না।

কিছুকাল আগেও সে চৈতির চিঠির প্রত্যাশা করত। ভাবত, হয়ত চৈতি তাকে চিঠি দেবে। সে চিঠিতে কয়েক দফা সর্তসাপেক্ষ সন্ধি তথা আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব থাকবে। সে স্থির মনে সিদ্ধান্তে এসেছিল, তেমন কোন প্রস্তাব এলে জয়-পরাজয়, লাভ-লোকসানের অংকে না গিয়ে এক কথায় সে সন্ধি মেনে নেবে। অথচ, এখনো বুক উজাড়-করা মুঠো মুঠো বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ছড়ায়—চৈতির কোন চিঠিই এলো না।

আজকাল তার ঘরময় চূড়ান্ত অপরিচ্ছন্নতা। জিনিসপত্তর অগোছালো। কার্ণিশে ঝুল। মেঝেয় ধূলো। ছাইদানীতে পুঞ্জীভূত সিগারেটের টুকরো এবং ছাই। মেঝেয় কুঁজো উপচে পড়া জলের দাগ। বিছানা মশারীতে কেমন যেন তেল চিটচিটে দুর্গন্ধ। এখনো চৈতির আটপৌরে কাপড় আলনায় ঝুলছে। দেয়ালের তাকে আয়নার সামনে খোপার বল। ভুলে ফেলে যাওয়া চৈতির হাত ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। চুলের কাঁটা ফিতে সেফ্‌টিপিন এবং ব্লাউজের হুক। সিঁদুর কৌটো এবং কিছু অনাড়ম্বর প্রসাধন দ্রব্য। বিয়ের পর ষ্টুডিওতে তোলা যুগল-ছবি। সবই আছে; কিন্তু চৈতি না থাকায় কোন কিছুই ঠিকঠাক নেই। মাঝে অবশ্য দিন কয়েকের জন্য এই ঘরের চেহারা সাময়িক পাল্টেছিল।

সেই যখন তার গুটি বসন্ত হয়েছিল তখনকার কথা মনে পড়ল। লোক-মুখে খবর পেয়েও চৈতি আসেনি। বিছানায় শয্যাশায়ী অবস্থায় তার মুখে অন্নপথ্য তুলে দেবার মত কেউ ছিল না। তখন বিনা আহ্বানেই রঞ্জুর মা মমতা অপ্রত্যাশিতের চমক লাগিয়ে তার ঘরে এসেছিল।

মমতা প্রতিদিন তার ঘরে আসত। ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঠিকমত ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখত। মুখে অন্নপথ্য দিত। এমন কী তার শিয়রের কাছে বসে সে বসন্তগুটিতে চন্দনের প্রলেপ লাগাত। চুলের অরণ্যে হাত বোলাত; এবং তার হাতের আঙুলগুলো নিজ মুঠিতে নিয়ে খেলা করত।

সেইসব বিশেষ মুহূর্তে মমতার উত্তপ্ত ভালবাসার পরশ পেতে পেতে সে আত্মসুখের পরম প্রশান্তিতে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল। যদিচ, মমতার উপস্থিতি

ভাল লাগত। তার সমস্ত নিঃসঙ্গতা বিষাদ ভুলে যেত; এবং প্রাণমন জুড়ে আশ্চর্যময় পরিপূর্ণতা ও রক্তচাঞ্চল্য অনুভব করত; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হত, মমতা পরস্ত্রীমাত্র। মমতার সিঁথি এবং কপালের উজ্জ্বল সিঁদুরে স্থির দৃষ্টি ফেলে দ্বিধা সংকোচে কুঁকড়ে গিয়ে সে একদিন প্রশ্ন করেছিল, আমার জন্ত অহেতুক কষ্ট করছেন কেন? মমতা প্রত্যুত্তরে বলেছিল, আপনার কষ্ট আমাকে কষ্ট দেয় বলে। উত্তরটা শুনে সে নির্বাক চোখ চেয়ে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে ছিল। কোন কথাই আর বলতে পারেনি।

সে নতুন করে আর কোনদিন অমনতর বোকার মত প্রশ্ন করেনি। কারণ পরিবর্তিত সময়ের ব্যবধানে সে নিজেও বুঝতে পারছিল, ভালবাসা বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। স্বাভাবিক নিয়মেই তারা দু'জনে ক্রমশঃ কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। প্রিয় আপনজন হয়ে উঠছে।

মানসিক অনেক দ্বন্দ্বদোলার পর সে একদিন মমতাকে বলেছিল, স্বামী, সংসার, সন্তান—আপনার ভূমি বায়ু আকাশ। এই তিনের উপর ভিত্তি করে আপনি বেঁচে আছেন। বাঁচতেও হবে। সুতরাং, এখানে এসে নিজের সংসারে অশান্তি না বাড়ানোই ভাল।

মমতা কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর প্রশ্ন করেছিল, আমার সাংসারিক প্রয়োজনের আলো জ্বালিয়ে বাড়তিটুকু যদি এখানে জ্বেলে দেই তাতেও আপত্তি?

এত সুন্দর অর্থবহ কাব্যিক একটা সংলাপ মমতার মুখ থেকে শুনে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ কোন উত্তরই খুঁজে পায়নি। পরে অবশ্য নির্মম সোজা উত্তর দিয়েছে, হ্যাঁ, আমরা দু'জনেই বিবাহিত। সুতরাং আপনার না আসাই ভাল। তারপরও মমতা এসেছিল। সে পূর্ণ সুস্থ হতে এখন আর আসে না। এখন প্রতিদিন সকালে সে যখন রান্নাঘরের অপরিচ্ছন্ন মেঝেয় নিকোন দেয়, উঠোনে কুয়োতলায় বাসন মাজে—মমতা তখন বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

সে স্পষ্টত বুঝতে পারে, তার সামান্য আহ্বানেই মমতা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সব কাজ গুছিয়ে দিতে রাজী; এবং তা হাসিমুখেই। চাই কী তার মুখের কাছে খাবার থালাটাও তুলে ধরতে পারে। সেই আশাতে কারণে অকারণে হামেশা তার ঘরের পিছন দরজায় ঘুরে যায়। অথচ, করাঘাত করে সাড়া জাগাতে সাহস পায় না।

তার কেবলই মনে হয়, চৈতি কেন যে বুঝলো না—তার জন্ত একজন প্রতীক্ষা প্রত্যাশার আপনজন বেঁচে আছে। সে যে তাকে কী গভীর ভালবাসে। সে চৈতি-স্মৃতি নিয়ে অবসর সময় কাটায়। চৈতি-ভাবনায় উদাসী হয়ে যায়। সে যে সেই ছোটবেলা থেকেই একটুকু ভালবাসার জন্ত নিরন্তর নিঃস্তব্ধ কাঁদে। তার বুকের ভিতর গোপন কষ্ট বিন্দু বিন্দু ঝরে। বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে আজকাল তার প্রায়শই মনে হয়, ভালোবাসার জন্ত তার কাঙালিপনা বোধ হয় চিরকালের ললাট লিখন।

ইদানীং লিভারজনিত অসুখে তার অনেক কষ্ট। খাওয়ায় অরুচি গা বমি বমি ভাব। নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। ভীষণ ক্লান্ত ও দুর্বল লাগে। মাঝে মধ্যে হঠাৎ জ্বর হয়। প্রাত্যহিক খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে অবশ্য পালনীয় ডাক্তারের হরেকরকম নির্দেশ। এমন পরিস্থিতিতে মমতার সাহায্য পেলে ভালই হয়। তবু, বিবাহিত স্ত্রী বেঁচে থাকতে হাত পেতে অন্ত কারও সাহায্য নিতে কোথায় যেন বাধে। মনের গভীরে তিরতির প্রবাহ গোপন যন্ত্রণা হয়। সেজন্ত অনেক চেষ্টায় মমতাকে এড়িয়ে যন্ত্রণাদগ্ধ অহং নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকতে সচেষ্ট থাকে।

ক্রমশঃ রাত নিস্তব্ধ হয়। কী যেন একটা রাতজাগা পাখি মাঝেমধ্যে বিদঘুটে আওয়াজ তুলে ডেকে উঠছে। দূরে কাদের বাড়ীতে রেকর্ড-প্লেয়ারে বাছাই করা রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজছে। হৃদয় ছোঁয়া শব্দ সুর ভেসে আসছে। সে আত্মমগ্ন উদাস দৃষ্টি ফেলে সামনের জানলায় চোখ রাখল। দেখল, বাইরে আলো জ্বলছে; অর্থাৎ বিদ্যুৎ এসেছে। তবু ইচ্ছে করেই সে তার নিজের ঘরের আলো জ্বালাল না। অন্ধকারে অনুমানে শিয়রের কাছ থেকে লুঙ্গিটা হাতড়ে নিয়ে পড়ল। তারপর সামনে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল।

তার এই টেবিলের সোজা মমতার ঘরে একটা জানলা দেখা যায়। জানলাটা হামেশা খোলা থাকে। পর্দাটা গোটানো। সে একাধিক দিন অনেক রাত পর্যন্ত ওই জানলার শিক ধরে স্বামীর প্রতীক্ষায় মমতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ওর স্বামী অনেক সকালে দূরে কোন কারখানায় কাজে যায়। গভীর রাতে নেশা করে মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে। অশ্রাব্য খিস্তি খেউড় চিৎকারে তোলপাড় করে। মমতাকে মারধর করে। কখনও বা

তার আগে কিংবা পরে বারান্দায় উবু হয়ে বমি করে দেয়, এবং নিস্তেজ হয়ে যায়।

সে হঠাৎ মনের ভিতর চাপা উত্তেজনা ও অস্থির চাঞ্চল্য অনুভব করল। উঠে দাঁড়িয়ে অশান্ত পায়চারী করতে করতে পিছন জানলায় দৃষ্টি ছুটিয়ে দিল। দেখল, মমতা সেই পরিচিত বিশেষ জানলার শিক ধরে এদিকেই তাকিয়ে আছে। দূর থেকে তার চোখ মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। সুতরাং ভাবান্তর বোঝা মুস্কিল। তবু, অনুমান করে অস্বস্তি বোধ করল। মমতার জন্য দুঃখ হ'ল।

এই মুহূর্তে মমতাকে পরস্ত্রী এবং এক্তিয়ার অধিকারের বাইরে জেনেও তার মন অবুঝ অশান্ত হয়ে উঠল। একগলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে সঙ্গীত আলো আনন্দময় জীবনের প্রার্থনায় ভাবল, মমতা এখন কাছে এলে কেমন হয়! প্রশ্নটা মনের ভিতর ঘুরে ফিরে অবিরাম তোলপাড় করল। রক্তপ্রবাহ দুর্বার গতিময় হ'ল। অথচ, সে কিছুতেই কোন যুতসই উত্তর খুঁজে পেল না।

তার বুকের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা ভয়ঙ্কর ভারী। স্নায়ু চঞ্চল। মনে হারজিৎ-এর পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বদোলা। সে মমতার মুখোমুখি জানলার শিক ধরে দাঁড়াল। কিন্তু স্পষ্ট কিছু দেখতে পেল না। এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ ক্লান্তি বোধ করল। বুক বগল এবং কপালে হাত রেখে শরীরের উত্তাপ যাচাই করল। জ্বর হয়েছে কিনা বুঝতে পারল না। তবু, স্থির সিদ্ধান্তে এল, তার ভিতরে এখন ভীষণ অসুখ। সুতরাং সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শোবার আগে পিছন দরজার অর্গল খুলে রাখতে গিয়ে অনেক চেষ্টাতেও পারল না। কেমন যেন দ্বিধা সংকোচ এবং অহেতুক মনে হ'ল।

সে অনেক চেষ্টা চালিয়েও গভীর রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না। ঘুম না-আসা পর্যন্ত ঘরের ভিতরকার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আর হিমশীতল নীরবতার বুক চিরে দেয়াল ঘড়ির শব্দ শুনতে থাকল। বুকের গভীরে হৃদস্পন্দনের সঙ্গে সেই শব্দের সামঞ্জস্য খুঁজতে খুঁজতে একসময় খেয়াল হ'ল, সামনের দরজায় টোক্কর জন্য নিশ্চিত বিশ্বাসে কান পেতে থাকা অভ্যাসটা কখন যেন পিছন দরজায় মমতার জন্য প্রতীক্ষা হয়ে গেছে।

প্রতিহত শৈশব

পিনাকীরঞ্জন গুহ

ছেলেটা একটু দুষ্টু হলে ভালো লাগত নবীনের। ছেলেটা একটুও দুষ্টু নয়। পাঁচ-ছ'বছরের বাচ্চাদের এরকম মানায় না। একটুও না। সকাল সাড়ে সাতটায়, সে এখন বাইরের বারান্দায় রেলিঙে চোখ রেখে দূরের কী যেন দেখছে। একটু আগে নবীন এবং নন্দিতার সঙ্গে সকালবেলার টুকটাক খাবার খেয়েছে। অন্যান্য ছেলেরা এই সময়টায় পড়তে বসে। ও বসে না। আবার কোনদিন বসলে উঠনো যায় না। নবীন ওকে কোনদিন পড়াশোনার জন্য জোর করে নি। নন্দিতাও না। বানান ক'রে মনে মনে সে খবরের কাগজ পড়ে। একদিন ওরকম দেখে নন্দিতা তরল করে নবীনকে বলেছিল— 'নবীনের ছেলেটি বড়ো প্রবীণ হয়েছে দেখছি।' এ কথায় নবীন হাসতে পারেনি। কেমন এক রকম অন্যমনস্ক ভাবে খুটখাট্ ক'রে সিগারেট ধরিয়েছিল। নন্দিতাও কথা বাড়ায়নি। পা বাড়িয়ে দিয়েছিল রান্না-ঘরের দিকে। আরেকদিন নন্দিতা বলেছিল—'ও তো ছোট একটা 'তুমি', এইটুকু বয়স থেকেই পুরোপুরি তোমার মত হয়ে যাচ্ছে।' নবীন ভাবছিল, ছেলেটা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো!

—কৌশিক তুমি ছবি আঁকতে পারো?

—না, বাপী।

—তুমি গান গাইতে পারো?

—না বাপী।

—কৌশিক, তুমি কবিতা বলতে পারো?

—না বাপী।

—তবে কী পারো? হাঁদা গঙ্গারাম কোথাকার!

মনে মনে রেগে ওঠে নবীন। আসলে সে এসব কথা কোনদিন কৌশিককে জিজ্ঞাসা করে নি। তাছাড়া কৌশিক তো তার খাতার পাতায় রঙ-পেন্সিল দিয়ে পাখি-গাছ-গাছালি আকাশ এঁকেছে। কৌশিকতো 'আগুনের পরশমণি

ছোঁয়াও প্রাণে' বেশ ভালোই গাইতে পারে। মাঝে মাঝে সে 'টুইংকল টুইংকল লিটল্ স্টার' অথবা 'আমি হব সকালবেলার পাখি' বেশ চমৎকার সুরেলা করে বলতে পারে। নবীন তাহলে রেগে যাচ্ছে কেন! আসলে নবীন ছেলেকে একটু শাসন করতে চায়। শিক্ষা দিতে গেলে যে রকম একটু আধটু সব বাবাই করে। নবীনের সেই পাওনাটুকুও নেই। কৌশিক একটা নির্ভেজাল নিরীহ বালক। ছোটখাট বুদ্ধদেব। নন্দিতার কথাই ঠিক —নবীনের ছেলেটি বড়ো প্রবীণ হয়েছে!

নবীন ভাবতে লাগল নিজের ছেলেবেলাটা। নবীনের বাবা ভুবনমোহন কাপড়ের ভিতর শার্ট গুঁজে দিতেন। তার উপর পরতেন খয়েরী রঙের একটা কোট। জামার হাতায় দু-ভাঁজ করা ইংলিশ-কাপ ডিজাইন, তাতে তিনি ছোট্ট চেন-বাঁধা বোতাম লাগাতেন। কোটের বুক পকেটে থাকত ঘড়ির গার্ডচেন। ভুবনমোহন কাজ করতেন 'হোয়াইট্‌ওয়ে ল্যাডলো'র দোকানে। সেকালের কলকাতায় পয়লানম্বরী দোকান। তখন ধুতির সঙ্গে ফিতে বাঁধা জুতো আর মোজা পরবার ব্যাপক রেওয়াজ ছিল। ভুবনমোহনও পরতেন।

নবীন তার শৈশবে বাবার কাছ থেকে অনেক অকল্পনীয় জিনিষ উপহার পেত। সমবয়সী সব ছেলে সে সবের নামই জানত না, দেখা তো দূরের কথা। রঙীন জল ভরা পাখী, টুকরো রঙীন কাঁচের বাহারী দূরবীন, মাউথ অরগ্যান আর পিপারমেণ্ট লজেঞ্চুস্। মাউথ অরগ্যানটা দু' ঠোঁটের মাঝখানে বেহালার ছড়ের মতো এমাথা-ওমাথা টানাটানি করলে এবং মুখ দিয়ে ফুঁ দিলে বিচিত্র শব্দ তুলে বাজত। নবীনের কাছে সেটা ছিল পরম বিস্ময়কর বস্তু। শেষে একদিন বাঁশীটিকে সে ভেঙে ফেলে ভিতরের কলকজা দেখেছিল। বেজে ওঠবার রহস্যটা ধরতে পারে নি। দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে মজাদার রঙীন নকশা দেখা যেত। নবীন তখনো 'রুহিতন' শব্দটা চিনতো না। দূরবীনের মধ্যে লাল-সবুজ-হলদে কাঁচের অনেকগুলি রুহিতন ছিল।

ভুবনমোহন প্রায় রবিবারেই ছেলের হাত ধরে এখানে সেখানে বেড়াতে যেতেন। নবীনের বয়স তখনো দশ পেরোয় নি। সে রাস্তায় বেরিয়ে মুখ বুঁজে থাকতে পারতো না। এটা কি? ওটা কেমন করে হয়?—এসব প্রশ্নে ভুবনমোহনকে অতিষ্ঠ করে তুলত। ভুবনমোহন যথাসম্ভব উত্তর দিতেন

ছেলেকে। ঘোড়ায়টানা ফিটন গাড়ি দেখে কখনো হাঁ করে থাকতো নবীন। ভুবনমোহন একদিন বাড়ির সবাইকে ঐ ফিটন গাড়ি চড়িয়ে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দিনেই কুলপী বরফ খেয়ে নবীনের গলা বসে গিয়েছিল। মা অনেকদিন পর্যন্ত সে-কথা বলে হাসতেন।

নন্দিতা ভিতরের ঘরে কি সব করছিল। ভিতর থেকেই বলল,—'আজ আর বাজারে যাবে কখন?' নবীন একটু অপ্রস্তুতের মতো কাঁপা গলায় উত্তর দিল—'এই তো, যাচ্ছি।' চেয়ার ছেড়ে উঠবার আগেও কৌশিককে একটু দেখে গেল। সে তখনো একচোখো বায়স্কোপের বাক্সে চোখ লাগিয়ে দেখার মতো করে, রেলিঙে চোখ রেখে রাস্তায় গাড়ী—লোকজন দেখছিল।

নন্দিতা আলনার কাছে দাঁড়িয়ে কাপড় গুটি করছিল। নবীন ঘরে এসেছে টের পেয়ে বলল—'নোলকের মা টাকা চাইছিল।' নবীন খানিক থমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কার মা?'

নন্দিতা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—'নোলকের মা। আমাদের বাসন-পত্তর মাজে, জল তোলে। যাকে দেখতে নাকি তোমার এক পিসীমার মতো।' বলে মুখ টিপে হাসতে লাগল নন্দিতা।

নবীন আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল—'নোলক, বাঃ নামটা ভারী চমৎকার তো!' নন্দিতা সেই হাসি, দু ঠোঁটের উপর, চোখের কোণায় ছড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'তোমার মেয়ে হলে 'নোলক' নাম রাখবে নাকি? দোহাই তোমার, তবে আমাকেও আশপাশের লোক নোলকের মা ব'লে ডাকতে শুরু করবে।' নন্দিতার কপট শঙ্কার ভাব দেখে নবীন হাসল কিন্তু কিছু বলল না। গায়ে আধ-ময়লা পাঞ্জাবীটা চড়িয়ে ব্যাগ-হাতে নীচে নেমে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবল, নোলক কী শুধু ঝিয়ের মেয়েদেরই নাম হয়! না হলে নোলকের মা হতে নন্দিতার অত লজ্জা কিসের!

পথে কৌশিকের মতো অনেক বাচ্চা রবারের বল ছোঁড়াছুড়ি ক'রে কী একটা খেলা খেলছিল। নবীন যেতে যেতে তাদের দেখল। পাশের বাড়ীর সাধন দত্ত প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল,—'আরে নবীনবাবু বাজারে চললেন নাকি? তা এত দেরী কেন?' নবীন একটু ময়লা হাসি হাসল। কিছু বলল না। সাধন দত্ত নিজের হাতের বাজারের ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে

ফের বলল—'বুঝলেন, মাছের দামটা ব্রড জাম্পের মতো বেড়ে যাচ্ছে। গিন্নী অনেকদিন থেকেই পাবদা মাছের কথা বলেছিল, তা আজ কিনেই ফেললাম। এসব কী আর আমাদের পোষায়, আট টাকা কিলো।' সাধন দত্ত চ্যাম্পিয়নের হাসি হাসল। তার মুখ থেকে সুগন্ধি জর্দার গন্ধ পেল নবীন। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে আরেকবার সে ফুটপাতের চঞ্চল বাচ্চাগুলিকে দেখল। পিছনে না তাকিয়েও কিছু দূরে গিয়ে নবীন শুনতে পেল সাধন দত্ত তার ছেলেটাকে চোটপাট করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

পথ পার হতে গিয়ে সামনে—উঁচুতে কী একটা বিজ্ঞাপনে একটি ঢলঢলে ছেলের মুখ দেখতে পেল নবীন। অনেকদিন আগেকার পড়া অলিভার টুইস্টের কথা মনে পড়ল। সেই সঙ্গে কৌশিককেও। কৌশিক বোধ হয় এখনো বারান্দায় দাড়িয়ে চলতি পথের ছবি দেখছে। কিংবা তার মায়ের কাছ ঘেঁষে হয়তো এটা-সেটা দু'একটা প্রশ্ন করছে। যেসব প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক না জানার জন্য বিরক্ত হয়ে উঠছে নন্দিতা। যেমন একদিন কৌশিক তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'ও বাড়ীর টুটুলের মা সিঁদুরের টিপ পরে, তুমি পরো না কেন না মা?' অথবা আরেক দিন শুধিয়েছিল—'আচ্ছা মা, রেকর্ডের মধ্যে গান কেমন করে আসে?' কিংবা আরেকদিন জানতে চেয়েছিল—'আমাদের বিড়ালটার পেটের মধ্যে তিনটে বাচ্চা কেমন ক'রে ছিল মা?' নন্দিতা এসবের কোনো সদুত্তর দিতে না পেরে রেগে উঠেছে। সরিয়ে দিয়েছে কাছ থেকে। আহত কৌশিক তার বাবার কাছে এসেও তেমন সাহস পায়নি। কেননা, নবীন তখন হয়তো খবরের কাগজ পড়ছিল অথবা কাশীতে সোনা পিসীমাকে চিঠি লিখছিল। অগত্যা ব্যর্থ এবং অতৃপ্ত কৌশিক সেই বাইরের বারান্দায়—রেলিঙে মুখ রেখে রাস্তা দেখার কাজটাই বেছে নিয়েছিল।

গাড়ীর হর্ণ শুনে রাস্তার ধারে সরে এল নবীন। চোখ তুলে দেখল, হিন্দু সৎকার সমিতির রূপালী গাড়িটা দ্রুত বাঁ থেকে ডানে ছুটে যাচ্ছে। পা চালিয়ে বড় রাস্তা পার হয়ে প্রায় বাজারের কাছে এসে পড়ল নবীন। অনেকেই বাজার সেরে ফিরে যাচ্ছে। কাগজওয়ালা সাইকেলে ঠুং ঠাং পরিচিত শব্দ তুলে প্রায় ফুটপাত ঘেঁষে নবীনের কাছে এসে থামল। নবীন থমকে গিয়ে মুখ তুলতেই কাগজওয়ালা হাসল। বলল—'এ মাসে মাইজী একঠো সিনেমার বই

লিয়েছে।' নবীন একটু অপ্রস্তুত স্বরে বলল—'কাল নয়, পরশু নিয়ে নিও কেমন ?' কাগজওয়ালা ফের সেই হাসি হেসে ঘাড় কাৎ করল। চলে গেল চোখ না ফেরাতেই। নবীনের মনে পড়ল—অনেকদিন থেকেই সে কৌশিককে কিছু ভাল বই এনে দেবে ভেবে রেখেছিল। নবীন ভাবল—আগামী মাসে আর কাগজ নেবে না। নন্দিতার সিনেমার বই—যত্তোসব ইনোসেন্ট—একটু যেন উষ্ণ হল, নবীন। ভুবনমোহনও তো সেকালের বিলিতি ছড়ার রঙ ন বই নবীনকে এনে দিতেন। সে সব বইগুলির গন্ধ ভারী ভালো লাগত। ঢাউস-বইগুলোর মজাদার ছবিগুলি কেটে জুতোর বাক্সে বায়স্কোপ তৈরী করেছিল নবীন। একদিন ধরা পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড বকুনি খেতে হয়েছিল। এখন বাজারের সামনে দাঁড়িয়ে সে কথা মনে পড়ে যাওয়ায় নবীনের ঠোঁটের কোণায় হাসি ছড়িয়ে গেল। সিনেমার বই কিনে পয়সা নষ্ট করার জন্য নন্দিতার উপর যে রাগ জমে উঠেছিল বেমালুম তা ভুলে গেল নবীন।

বাজারের মুখে ভীড় বেশ হাল্কা হ'য়ে এসেছে। গুটি চারেক অল্পবয়েসী ছেলে লাইটপোস্টের দড়ি থেকে সিগারেটে আগুন ধরিয়ে নিচ্ছে। তারা প্রত্যেকেই বাজার করতে এসেছিল, পয়সা বাঁচিয়ে এখন সিগারেট খাচ্ছে। নবীন তাদের পাশ কাটিয়ে ফুটপাতের ফাঁকা জায়গা ধরে ফিরতে লাগল। এক বেলুনওয়ালা একরাশ হরেক-রঙা বেলুন নিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। নবীনের মনে পড়ে গেল খুব ছেলেবেলাতেও কৌশিক বেলুন বিশেষ পছন্দ করতো না। নন্দিতা কতদিন ওকে বেলুন দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছে, পারে নি। নবীন তাকিয়ে দেখল বাহারী বেলুনগুলি। শৈশবে তার খুব টান ছিল বেলুনের উপর। ভুবনমোহন প্রায়ই বিলিতি বেলুন এনে দিতেন। তখনো বাজারে এত বেলুনের প্রচলন হয়নি। একবার ক্রীষ্টমাসের সময়ে পুরো এক প্যাকেট বেলুন ফুলিয়ে সুতো বেঁধেছিল। সে এক ভীষণ খুশীর ব্যাপার। এখন ভেবে নবীনের একরকম লজ্জা হোল—আনন্দ হ'ল এবং দুঃখও হ'তে লাগল। কৌশিক যদি বেলুন পেয়ে খুশী হোত তবে মাত্র কয়েকটা পয়সায় দুটো-তিনটে বেলুন কিনে নিতে পারত নবীন।

নিজের হারানো শৈশবের জন্য তার দুঃখ হতে লাগল। ছেলেমেয়েদের জন্য ভুবনমোহন কত কিছুই না আনতেন। হাণ্টলি পামারের বিস্কুটের স্বাদ এখনো যেন ঠোঁটে লেগে আছে নবীনের। মাঝে মাঝে বাগবাজার গেলে ছানার

মুড়কী আনতেন। নবীনের জন্ম যেদিন প্রথম একটা সিংহের মুখ বসানো বেল্ট আনলেন, সেদিন আর নবীনের খুশীর অন্ত ছিল না। পরের দিন থেকে সেই বেল্ট লাগিয়ে স্কুলে গিয়ে একটা কেউ-কেটা হয়ে পড়ল নবীন। মায়ের সঙ্গে সেই ছেলেবেলায় একদিন ভবানীপুরের কী একটা হলে 'চণ্ডীদাস' ছবি দেখতে গিয়েছিল। বাড়িতে ফিরবার পর ভুবনমোহন কোলের কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'কী দেখলে খোকা?' নবীন সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল—'একটা লোক পুকুরে মাছ ধরছিল। সেই লোকটাই না আবার মন্দিরে পুজো ক'রছিল, বাবা'। ছেলের কথায় গা দুলিয়ে হেসে উঠেছিলেন ভুবনমোহন। অথচ প্রায় দিনেই নন্দিতা সিনেমায় গেলে কৌশিককে অন্য কোথাও রেখে যায়। নবীন একদিন কৌশিককে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতেই রেগে উঠেছিল নন্দিতা—'কোথায় একটু খোলামেলাভাবে সিনেমায় যাব, তাও পিছনে একটা ল্যাং-বোট নিয়ে যাও। তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি নাও'।

আর কথা বাড়ায়নি নবীন। অবশ্য দু'একদিন অন্যান্য জায়গায় কৌশিককে নিয়ে গেছে। চিড়িয়াখানায়, যাদুঘরে, বিড়লা প্লানেটোরিয়ামে। আশ্চর্য যে, কৌশিক একবারও রাস্তায় রকমারী খাবার দেখে বায়না ধরেনি। বরং নবীন অনেকবার তাকে কিনে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ছ'বছরের কৌশিক পরম বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে নিষেধ জানিয়েছে। আহত নবীন অন্তত কিছু বাদাম, দুধ-চকোলেট অথবা পটেটোচিপস্ কিনে দিতে পারলেও খুশী হোত। এই সব সময়ে নবীনের পয়সা-কড়ি-অভাব-অনটনের কোনো কথা মনে না রেখে ছেলেকে তৃপ্ত রাখতে ইচ্ছা করে। অথচ হয় না। দুঃখিত নবীন ছেলের হাত ধরে বাড়ি ফেরে সন্ধ্যার পর। নন্দিতা তখন রান্না ঘরে কী যেন খুটখাট করছিল। শব্দ পেয়ে ঘরে এসে বলল—'রাজা আর রাজপুত্রের ভ্রমণ শেষ হোল!' নবীন জামা-কাপড় ছাড়ছিল, কথা বলল না। কৌশিক বেতের মোড়ায় বসে পা দোলাচ্ছিল। বলল—'প্ল্যানেটোরিয়াম মানে কী মা?' নন্দিতা ঘর থেকে কী একটা নিয়ে বেড়িয়ে যেতে যেতে উত্তর দিল—'তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো।' নবীন মনে মনে একটা কথা ভেবে নিঃশব্দে হেসে উঠলো, কেউ দেখলো না। নন্দিতার ভাব দেখে পুরনো দিনের একটা মজার কথা মনে পড়ে

গেল নবীনের। সেই ভাব গোপন রেখে গম্ভীরভাবে ছেলেকে বলল—'প্যাণ্ট-জামা ছেড়ে ফেল, হাত-মুখ ধুয়ে এস; খাও।' কৌশিক দ্বিতীয় কথার আগেই নির্দেশ পালন করতে চলে গেল।

ফুটপাত ধরে আনমনে চলতে-চলতে দু'একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেল নবীন। রোদ্দুর বেশ কড়া হয়ে আসছে। আজকে নির্ঘাৎ অফিসে দেরী হয়ে যাবে। নন্দিতা নিশ্চয়ই বাজারের দেরী দেখে নবীনের শিথিল স্বভাবকেই দায়ী করছে বারবার। অথচ নবীন জানত কোথাও দেরী করে নি—কারুর সঙ্গে কথা বলেও সময় নষ্ট করে নি। শুধু নিজেরই সঙ্গে একটানা কথা বলতে গিয়ে হয়তো পথ-চলার গতি অনেকটা শিথিল করে ফেলেছিল। রাস্তা পার হয়ে বাড়ির কাছেই ফুটপাতে উঠে এল নবীন।

পা চালিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতেই নন্দিতার চড়া গলা শুনতে পেল। এরকম হৈ-হট্টগোল একদম পছন্দ করে না নবীন। উপরে এসে দেখল—নন্দিতা সশব্দে চড় কষিয়ে দিয়েছে কৌশিককে। সে টু-শব্দটিও করছে না।

হতভম্ব নবীন বাজারের ব্যাগটা রান্নাঘরের দরজার কাছে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করল—'হয়েছে কি?' মারমুখী নন্দিতা ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিল—'কী আর হবে, তোমার গুণধর ছেলে এই ট্যাবলেট মাথা ধরার জন্য খাচ্ছিল।' হাতের মুঠো মেলে ধরে ট্যাবলেটগুলি দেখাল নন্দিতা। তার হাতে গুটি দুই বাদামী আকারের কনট্রাসেপ্‌টিভ ট্যাবলেট। নবীন জানে, মাসের কয়েকটা দিন ঠিক-ঠিক হিসেব রেখে এই ট্যাবলেট খায় নন্দিতা।

কৌশিক মার খেয়ে বাইরের বারান্দায় রেলিঙে ফিরে গেছে। নবীন আহত স্বরে বলল—'ওর মাথা ধরেছে জেনেও ওকে তুমি মারলে?' নন্দিতা উত্তর দিল না, বাজারের ব্যাগটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। নবীন ঘরে এসে পাঞ্জাবী খুলতে খুলতে ভাবতে লাগল—এইটুকু ছেলের মাথা ধরে কেন!

দ্বীপান্তর

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

ওরা দল বেঁধে চলে গেল।

যতক্ষণ ছিল ওরা ফ্ল্যাটটা যেন সংগরম ছিল। গান গল্প হাসি ঠাট্টা ফূর্তির উচ্ছল প্রকাশ, খাওয়া দাওয়া—সব মিলিয়ে বেশ নিজেদের অন্তর্লীন অবশ্যম্ভাবী বিষাদ ও অস্থিরতাকে ভুলে থাকা যাচ্ছিল। মানস টাকা দিয়েই খালাস। রেজিস্ট্রেশন অফিসে যখন শুভ কাজটি সুসম্পন্ন হচ্ছিল, তখনই ওদের জনকয়েক বেরিয়ে গিয়ে কেনা কাটা করেছে। ফুলের মালা, সিঁথিমৌর, চিংড়ির কাটলেট, মাটন চপ, মিষ্টি—সন্দেশ আর রসগোল্লা। নিউ মার্কেট থেকে কাগজের ডিস আর গেলাস কিনে এনেছিল। সেই ডিসে ডিসে নিজেরাই খাবার তুলে নিয়েছে। কেউ কেউ আবার আবদার ধরেছিল, না, বৌদি—মানে নীলিমা নিজের হাতে অন্তত: একটা মিষ্টি ওদের ডিসে তুলে দিক। নীলিমা হাসি মুখেই ওদের দাবী মেনে নিয়েছিল।

খেতে খেতেই শোভন গান ধরেছিল। পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি—শোভনের গান শেষ হলে সকলে একসঙ্গে দাবী জানাল নীলিমার গান শুনবে। ওরা এতদিন শুধু শুনেই এসেছে নীলিমা ভাল গান গায়। আজকের প্রথম সুযোগেই সেই শোনা কথার যথার্থতা নিরূপণ করবে। নীলিমা ক্লিষ্ট হেসে হাত জোড় করে বলেছিল—'আজ আপনারা আমাকে মাপ করুন'—একটু থেমে ম্লান অস্ফুট কণ্ঠে আবার বলল—'আজ গান গাওয়ার মত মনের অবস্থা নেই।'

তখন ওরাই আরো গান গাইল, হো হো করে উচ্চকিত হাসি হাসল, অল্প অশ্লীলতা ঘেঁষা কিছু ঠাট্টা করল। তারপর একে একে কব্‌জীতে ঘড়ি দেখে সকলেই বলল,—'না এবারে ওঠা যাক। রাত হল।'

ওরা কেউ হাওড়া যাবে, কেউ টালিগঞ্জ যাদবপুর, কেউবা বরানগর

বনহুগলী। সকলেরই বাহন সরকারী বাস। সুতরাং উৎসবে উৎসাহে ভেসে গিয়েও একটা চোখ সব সময় ঘড়ির কাটায় নিবদ্ধ রাখতে হয়। আজ আবার বিয়ের তারিখ। বাসে দৈনন্দিন ভীড়ের বোঝার উপর নিমন্ত্রিত জনদের শাকের আঁটি। রাত বাড়লে বাসে ওঠা দায় হবে। আচ্ছা বৌদি, চললাম। চলিরে মানস। আবার আসব।—নানাবিধ বিদায়সূচক কথাবার্তা। নমস্কার প্রতি নমস্কার। দলবদ্ধভাবে সকলে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে এখন সুনিবিড় নিস্তব্ধতা। নতুন কেনা খাট আলমারী সোফা সেটি ঠিকঠাক সাজানো হয়নি। ওরা খাটটা সেট করে দিয়েছিল—এই পর্যন্ত। কোন্‌টা কোথায় থাকবে, কিভাবে সাজানো হবে দুটো ঘর তা কালকে ঠিক করা যাবে। এখন ক্লান্ত লাগছে খুব ক্লান্ত। সারাদিন খুব শারীরিক ধকল গেছে। সঙ্গে মনের উপর প্রবল চাপ। শরীর আর বইছে না। স্নায়ুতন্ত্রী বিপর্যস্ত।

মানস হাই তুলল। তারপর নীলিমার দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মতো একটু—হাসল। নীলিমা যেন কর্তব্যবোধ থেকেই অল্প হাসির প্রত্যুত্তর দিল। ঘরের নিস্তব্ধতা অসহ্য লাগছিল। মানস কিছু বলার জন্যই বলল, —ঐ জমকালো ভারী শাড়ীটা এবারে ছেড়ে ফেল। আর যাও; বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে একটু জল দিয়ে এস। ভাল লাগবে—'

নীলিমা বলল,—যাই'—

কিন্তু ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নীলিমা খাটের নতুন বেশ বিছানার উপরে নতুন উঁচু উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে যেমন বসেছিল তেমনই বসে রইল।

ঘরের মেঝেতে বন্ধুদের ভুক্তাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। একপাশে উচ্ছিষ্ট ডিসগুলো থাকে থাকে সাজান। ওরা অবশ্য নিজেরাই পরিষ্কার করে দিতে চেয়েছিল। কাগজের ডিসগুলো বাইরে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে যাবে বলে প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু নীলিমা তা করতে দেয়নি। খুব প্রবলভাবে বাধা দিয়ে বলেছিল,—'আপনারা ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না ত। আমি রয়েছি কি করতে। যা করার আমিই করবো।'

আকীর্ণ মেঝের দিকে তাকিয়ে মানস বলল,—'ইস্। কি অবস্থা হয়েছে ঘরের—' বলে নিজেই পরিষ্কার করবে বলে কোমর বাঁধল।

সঙ্গে সঙ্গে নীলিমা সোজা হয়ে বসল। অল্প তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল,—'তুমি বোস ত। তোমার কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই আমিই করছি।'

মানস নীচু হওয়া অবস্থাতেই বলল,—'এই ডিমগুলো বরং আমি বাইরে ফেলে দিয়ে আসি—

'—কি দরকার। —নীলিমার কণ্ঠস্বরে যেন একটু অধৈর্য অসহিষ্ণুতা —বাথরুমে রেখে দিলেই তো হয়। কাল সকালে মেথরকে আট আনা পয়সা দিলেই সে খুসী হয়ে নিয়ে যাবে।'

মানস সোজা হয়ে দাঁড়াল—'তবে থাক।'

পায়ের কাছেই নতুন কেনা চামড়ার সুটকেসটা ত্যারছা হয়ে রয়েছে। সেটাকে বাঁচিয়ে নীলিমা মেঝেতে পা রাখল। নিজের চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে কোমরে আঁচল জড়াল। তারপর নতুন পলিথিনের বালতিটা একপাশ থেকে তুলে নিয়ে মানসের দিকে বাড়িয়ে ধরল। নরম গলায় বলল, —'এক বালতি জল এনে দেবে?'

কিছু কাজ পেয়ে মানস যেন বেঁচে গেল। তাড়াতাড়ি সে নীলিমার হাত থেকে পলিথিনের বালতিটা নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। কলের তলায় বালতিটা বসিয়ে কল খুলতেই মুখ দিয়ে তোড়ে জল বেরিয়ে এসে বালতি ভরে তুলতে লাগল। কল থেকে এই উচ্ছ্বসিত জল বেরিয়ে আসা, বালতিতে জলের তল দ্রুত উপরে উঠে আসছে—দেখতে দেখতে মানসের বুকের ভিতরে একটা অভিমান বালতির জলের মতই ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। আজকের এই দিনটা অনেক প্রত্যাশার আকাঙ্ক্ষার। বলতে গেলে তিন বছরে অর্থাৎ নীলিমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে—এই প্রথম ওরা দুজনে ঘনিষ্ঠ ভাবে একা হতে পেরেছে। এর আগে যত দেখাশোনা আলাপ প্রলাপ, ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মসূচী ছকা—সবই ময়দানে গঙ্গার ধারে অথবা দুকাপ চায়ের, মূল্যে কেনা কোনো রেঁস্তরার হাওয়া বাতাস-হীন গুমোট চৌকো খোপের স্বল্পায়ু অবসরে। নানা ছলে একজনের হাত অপর জনের হাত ছুঁয়ে গেছে মাত্র, একজন আর একজনের চোখের দিকে তাকিয়েই ,বুঝতে পেরে গেছে, মাঝখানে ছলনার ঐ আবছা আব্রু আর নিরর্থক। কারো মন আর কারো কাছে গোপন নেই। তখন হয়ত মানসের দুচোখ নীলিমার চোখের দিকে তাকিয়ে অসহায় অক্ষম

আবেদনে করুণ হয়ে উঠেছে : আমি আর পারছিনে। এস। কিন্তু উপায় নেই। চারদিকে লোক। চোখ রাঙানি! সামাজিক শালীনতা। উভয় তরফের অভিভাবকদের নিষ্করুণ কঠোরতা। অসম্ভব। এ হতে পারে না। এমন স্বেচ্ছাচার কিছুতেই মানব না। সুতরাং অনেক দুঃসাহস ও ত্যাগের মাধ্যমে আজকের এই দুজনের ছোট ফ্লাটে দুজনে কাছাকাছি হতে পেরেছে। এখন এই ফ্লাটে ওরা দুজনে ছাড়া আর কেউ নেই। যারা ওদের এই এক হওয়াতে সাহায্য করেছে—মানসের সেই বন্ধুরাও উৎসবের শেষে যে যার বাড়ি ফিরে গেছে। এখন মানস যদি নিবিড় আশ্লেষে নীলিমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে—কেউ দেখতে আসবে না। কোনো রক্ত চক্ষুর শাসানীতেই তার উদ্যত চুম্বন মাঝপথে তবে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কোনো নিষেধাত্মক তর্জনীই মুহূর্তে নিয়তির নির্দেশের মত খাড়া হয়ে নেই। এখন মানস নীলিমাকে নিয়ে যা খুশী করতে পারে। যা খুশী—।

কিন্তু আশ্চর্য ঠিক এখনই মনে হচ্ছে, নীলিমা যেন আগেকার নীলিমা নেই। কি নিস্পৃহ উদাসীন, উত্তাপহীন। আচরণে চাহনিতে বিন্দুমাত্র উষ্ণতা নেই। বরং তার সান্নিধ্য মানসের নিজেকে কেমন যেন অপরাধীর মত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সে যেন নীলিমাকে তার আত্মীয় বান্ধবদের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে এনেছে। সে যেন একটা দস্যু ডাকাত—ঠিক যখন মানসের ইচ্ছে হচ্ছে সে ঐ জলের কলের মতই উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তখন নীলিমা শীতলতার কি কঠিন খোলসের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। অথচ দুজনে মিলেই তো সব কিছু ভেবেছিল দুজনের মিলিত পরামর্শেই ঠিকঠাক হয়েছিল সব কিছু।

বালতি ভরে গিয়ে জল উপচে পড়ছিল। সম্বিত ফিরে পেয়ে মানস ভর্তি বালতি নিয়ে দ্রুত ঘরে এল। এসে দেখে অবাক হল যে এর মধ্যে নীলিমার অভ্যস্ত মেয়েলি হাতের ছোঁয়ায় ঘরখানা বেশ বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। ছড়ানো ছিটানো জিনিসপত্র কৌটো বাওটা নীলিমা সুন্দর করে এক ধারে গুছিয়ে ফেলেছে। বিছানার চাদরটা তুলে ঝেড়ে আবার টান টান করে পেতেছে। পাশাপাশি দুটো বালিশ। যে বালিশে মাথা রেখে আজ ওরা প্রথম পাশাপাশি শোবে। মানস ফিরে আসতে নীলিমা আলগোছে বলল,—'কলে জল নেই না কি ?'

মানস অপ্রতিভ ভাবে বলল—'না ত।'

—"এতক্ষণ লাগল কিনা। আমি ভাবলাম বুঝি কলে জল পড়ছে না—" সুটকেশ খুলে নীলিমা মানসের একটা ছেঁড়া ছেঁড়া গেঞ্জি বার করল,—

—"তোমার এই গেঞ্জিটা ন্যাতা করব ?"

—"বেশ ত।"

নীলিমা বালতিতে ন্যাতা ডুবিয়ে পরিচ্ছন্ন হাতে ঘরের মেঝে নিকিয়ে নিল। খাটের একধারে বসে বসে মানস নীলিমাকে দেখতে লাগল। নীলিমা ওর ঘরণী হয়ে এসে গার্হস্থ্য কাজ করছে। ওরা এখন স্বামী স্ত্রী। এই দু'কামরার ফ্ল্যাট ওদের সংসার। ওদের মিলিত বিবাহিত জীবন সুরু হল। কিন্তু সুরুটা যেন যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন ভাবে হল না। সেই আমেজটা কিছুতেই ধরা পড়ল না। সব কিছু যেন ছাড়া ছাড়া বেসুরো, প্রাণহীন—

ঘর মোছা শেষ করে নীলিমা নীচু হয়ে বসে সুটকেসের ডালা খুলল। সে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে চলে এসেছে। বিবেচক মানস তার জন্য শায়া ব্লাউজ কাঁচুলি সব কিনে গুছিয়ে নিয়ে এসেছে। নীলিমা সুটকেশ থেকে নতুন সব কিছু বার করল। বলল,—"আমি গা ধুয়ে আসছি—"

মানস বলল—"এত রাতে বেশী জল ঢেল না। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে—"

কোনো জবাব না দিয়ে ঠাণ্ডা চাহনিতে তাকিয়ে নীলিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বসে বসে মানস শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। সারাদিন শুধু ঘোরাঘুরি আর টান হয়ে বসে থাকা। মেরুদণ্ড আড়ষ্ট হয়ে গেছে। একটু শুয়ে হাত পা ছড়িয়ে শরীরটাকে একটু স্বস্তি দিতে পারলে ভাল হয়। মানস শিয়রে উঁচু বালিশের দিকে তাকাল। তারপর প্যান্ট সার্ট পরা অবস্থাতেই টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু শুয়েও সেই অবস্থাটা কাটল না। তখন মানস আবিষ্কার করল তার সেই অস্বস্তিটা যতটা দেহগত তার চেয়ে ঢের বেশী মানসিক। সে যেন স্থির হতে পারছে না চিরতরে বাড়ি ছেড়ে চলে আসা—এখনও

বাড়ির লোক কিছু জানে না—তারা জানে মানস অফিসের কাজে ক'দিনের জন্য কলকাতার বাইরে গেল—তার চিঠি পেয়ে জানবে মানস আর ফিরবে না—সে তার নিজের পছন্দমত মেয়েকে ঘরণী বানিয়ে পৃথক ঘর বেঁধেছে—তখন বাবা খুব রেগে যাবে—মা বাবার ভয়ে হয়ত লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদবে—

অস্থিরভাবে মানস বিছানায় উঠে বসল। সমস্ত ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া দরকার। সে মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়ছে। ভেঙে পড়েছ। যতক্ষণ বন্ধুরা ছিল হৈ চৈ করছিল ততক্ষণ ভুলেই ছিল। এখন এই নির্জনতা নিঃসঙ্গতা যেন নিজেকে নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি করে দিয়েছে। কোন কিছুতে নিজেকে ব্যস্ত ব্যাপৃত রাখা দরকার।—

মানস হাত বাড়িয়ে বন্ধুদের সম্মিলিত উপহার ট্রানজিস্টারটা তুলে নিল। কানে মোচড় দিতেই হিন্দী গান যেন তেড়ে এল। সেই সঙ্গে উদ্দাম বাজনা। মুহূর্তে নিস্তব্ধ ঘরখানা কোলাহলে গোলমালে গমগম করতে লাগল। কোনো কিছুই আর সুবিন্যস্তভাবে ভাবা হয় না। কোন ভাবই—করুণ বিষন্ন অথবা আনন্দিত উৎফুল্ল—মনে কোনা ছাপ ফেলতে পারে না। এই ভাল। শুধু ভেসে থাকা—

গা ধোয়া শেষ করে নীলিমা ঘরে এল। আটপৌরে শাড়িখানা আলগোছে নীলিমার অঙ্গে ঘরোয়া ভঙ্গীতে জড়ান। সন্ত স্নান করে আসায় নীলিমার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ গাত্রত্বক থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সিক্ত চুল চূর্ণ জলকণা তার কপালে ঘাড়ে খসে পড়েছে। নীলিমাকে ভারী সুন্দর পবিত্র দেখাচ্ছে। মানসের বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত অনুভূতি উদ্দাম হয়ে উঠল। একবার মনে হল, না, কিছু ভুল হয়নি। সে মুগ্ধচোখে যেন প্রতিমা দেখছে, নীলিমার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘরে পা দিয়েই নীলিমা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। এখন ভ্রূ কুঁচকে নিনাদিত ট্রানজিস্টরের দিকে তাকিয়ে শুকনো তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে মুছতে বলল—"আঃ। এখন আবার ওটাকে নিয়ে পড়লে কেন!"

চকিতে নব ঘুরিয়ে ট্রানজিস্টর বন্ধ করল মানস। তারপর অপ্রস্তুত হেসে বলল—"কেন, তোমার হিন্দিগান শুনতে ভাল লাগে না?"

নীলিমা বলল,—'এখন লাগছে না।'

আবার নীরবতা। নীলিমা নীরবে ড্রেসিং টেবিলের সামনে সরে গেল।

আলতো করে স্নো বুলিয়ে পাউডারের পাফ হালকাভাবে ছোঁয়াতেই সে যেন অপরূপ হয়ে উঠল। কড়ে আঙুলের ডগায় করে কপালে দুই ভ্রুর মাঝ খানে একটু উপরে ছোট সিঁদুরের টিপ পরল। চিরুণীর মাথায় সিঁদুর লেপে সিঁথিতে দিল। মানস নীরবে নীলিমার এই আশ্চর্য রূপচর্য্যা দেখল। সিঁদুর পরার কি অভ্যস্ত নিপুণ ভঙ্গী নীলিমার। কে বলবে জীবনে এই সে প্রথম নিজের হাতে সিঁদুর পরল। মনে হয় যেন এর আগে হাজার বার পরেছে। আসলে সব মেয়েদের এসব রক্তেই থাকে। রক্তের ভিতরে সংস্কার হয়ে খেলা করে। মানস ভাবল।

প্রসাধন শেষে নীলিমা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেল। মানস অবাক মুগ্ধ চোখে চোখের সামনে নীলিমার এই মনোহর পরিবর্তন লক্ষ্য করল। সে সাহস ভরে ভয়ে ভয়ে ডাকল—"নীলিমা—"

নীলিমা অপাঙ্গে মানসকে দেখল। তারপর নীরস গলায় বলল, —"ঐ নোংরা প্যান্ট সার্টগুলো এবারে ছেড়ে ফেল না। সারাদিন ধরে পরে আছো—"

মানস যেন নিভে গিয়ে বলল,—"হ্যাঁ। ছাড়ি।"

নীলিমা সুটকেস থেকে মানসের ডোরাকাটা পাজামা আর ফর্সা গেঞ্জী বার করে দিল,—"এই নাও।"

মানস হাত বাড়িয়ে নিল। কিন্তু উঠল না। বসেই রইল। নীলিমার ভাবলেশহীন নির্বিকরে মুখের দিকে একটু তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল,—"তোমার কি এখন আফশোষ হচ্ছে নীলিমা?"

নীলিমার মুখে একটু বিস্ময় ঘনাল,—'আফশোষ? আফশোষ কি জন্যে?'

—'সকলের অমতে এই ভাবে বিয়ে করলে—'

নীলিমা মানসের দিকে অপলকপাতে তাকিয়ে রইল। তারপর যেন একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল—'নাঃ! আফশোষ হবে কেন! যা করেছি সে অনেক ভেবে হিসেব করেই করেছি······একটু থামল নীলিমা। আবার বলল,—'আমিও কিছু কচি খুকী নই যে কারো কথায় ভুলে হঠাৎ একটা কিছু করে ফেলেছি······'

মানস কিছু বলতে গিয়েও কি ভেবে শেষ পর্যন্ত বলল না। শুধু মনে

মনে ভাবল, তাহলে তুমি অমন গম্ভীর হয়ে আছ কেন। কেন তোমার চোখের দুই ভ্রূতে ঐ মেঘের ভার? মনে হচ্ছে তোমার ঠোঁটের হাসিটুকু কেউ যেন স্পঞ্জ দিয়ে নিঃশেষে মুছে নিয়েছে। কেন তুমি সহজ হতে পারছ না।

নীলিমা প্রশ্ন করল,—'আমার বাবাকে চিঠি দিয়েছ?'

মানস তাড়াতাড়ি বলল,—'হ্যাঁ। দিলাম ত। রমেনের হাতে পাঠিয়ে দিলাম।

—'আমাকে একটু দেখালে না!'

মানস বিব্রত ভাবে বলল,—'ওরা এত তাড়াহুড়ো করে চলে গেল যে তোমাকে দেখান হল না—'

—'কি লিখেছ?

—'তুমি দেখবে?—" মানস ব্যস্ত হয়ে উঠল,— আমি কপি রেখেছি—'

নীলিমা নিস্পৃহ ভাবে বলল,—'দেখি—'

মানস প্যান্টের পকেট থেকে এক চিলতে কাগজ বার করল,—'এই নাও—'

নীলিমা বলল—'তুমিই পড়—'

মানস একটু চুপ করে রইল। একবার গলা খাঁকারি দিল। তারপর পড়ে গেল,—'পরম পূজনীয়, নীলিমার জন্য চিন্তা করবেন না। সে আমার কাছে আছে। এখন থেকে সে আমার কাছেই থাকবে। ইতি আশীর্বাদ-প্রার্থী মানস।'

নীলিমা চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল।

মান নরম গলায় বলল, —'কি ভাবছ নীলিমা?—'

নীলিমা মানসের দিকে তাকাল। ম্লান হাসল। বলল,—'ভাবছি চিঠি পেয়ে বাবা মা কি করবে?'

—'কি করবে বলে মনে হয়?'

—'কি আর করবে! সর্বনাশ হয়ে গেল বলে মাথা কপাল চাপড়াবে চীৎকার করে তোমাকে শাপমন্তি করবে। আর বাবা গম্ভীরভাবে বলবে—চুপ কর। মনে কর তোমার মেয়ে নেই। মরে গেছে।'

মানস না হেসে পারল না,—'আসলে সব বাবারাই এক রকম—'

—'কি রকম ?'

—আমি জানি, আমার বাবাও বলবে মাকে : ও ছেলের কথা ভুলে যাও। অমন ছেলেকে আমি ত্যজ্য পুত্র করলাম—'

নীলিমা মানসের দিকে তাকাল। তাকিয়ে তার চোখ ধীরে ধীরে কোমল হয়ে এল, —'আমার জন্যেই আজ তোমাকে এইসব মেনে নিতে হল—'

বিস্মিতভাবে মানস বলল,—'কোন সব ?'

—এই যে মার মনে কষ্ট দেওয়া, বাবাকে অসন্তুষ্ট করা, ভাই বোনের প্রাণে আঘাত দেওয়া—মানস নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীরব নরম ভালবাসায় উদ্বেল হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে এতক্ষণে এই প্রথম হাত বাড়িয়ে নীলিমার চিবুকে তর্জনী ঠেকিয়ে তার মুখখানা তুলে ধরল। নীলিমা কোনো বাধা দিল না। মানস নীলিমার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থকেতে থাকতে বলল,—'সেত নীলিমা, আমার জন্যে তোমাকেও—'

নীলিমা মুখ সরিয়ে নিল না। বরং কিসের প্রত্যাশায় যেন আরো একটু উপরে তুলল। তার আধ-বোজা চোখ, ঈষভিন্ন ওষ্ঠাধর অল্প অল্প কাঁপছে। মানস মুগ্ধ চোখে খুব কাছ থেকে নীলিমার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর খুব আস্তে আস্তে তার মুখের উপর নিজের মুখখানা নামিয়ে আনতে লাগল।

আর ঠিক সেই সময় বাইরে রাস্তায় সশব্দে ইংরিজী বাজনা বেজে উঠল।

ড্রুম-ড্রুম-ড্রুম-ড্রুম। ড্রাম বাজানর উদাত্ত গম্ভীর আওয়াজ। ক্ল্যারিওনেটের মিহি তীক্ষ্ণ সুর। অনেকগুলো ব্যাগ-পাইপের মিলিত ঐকতান। মধ্যে মধ্যে ঝাঁঝের তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ। সব কিছু যেন এক সঙ্গে রাস্তা থেকে ছুঁড়ে মারা বোমার মত ঘরের মধ্যে ফেটে পড়ল।

উদ্যত চুম্বন থামিয়ে মানস চমকে উঠল। চমকাল নীলিমাও। তার টান টান মেলা চোখে কিছু ভয় কিছু বিস্ময় ফুটল। বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল,—"কি ব্যাপার ? কি হল ?"

পলকে নিজেকে সামলে নিয়েছে মানস। সপ্রতিভ ভাবে বলল,—"বোধহয় বিয়ের প্রসেসন যাচ্ছে। চলনা দেখি—"

দুজনে ঝুল-বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মানসের আন্দাজ ঠিক। রাস্তা দিয়ে জমকালো একটা বিয়ের মিছিল যাচ্ছে। ব্যাণ্ড পার্টি সরবে হিন্দী গানের সুর বাজাচ্ছে। দুধারে বাহকদের কাঁধে আর মাথায় কারবাইডের উজ্জল বাতি সমস্ত রাস্তা আলোকিত করে তুলেছে। আগে পিছে অনেক গুলো গাড়ি অনেক লোক হেঁটেও যাচ্ছে, তাদের বেশবাস সুন্দর। প্রত্যেকের কবজীতে বেলফুলের মালা জড়ান, কেউ কেউ ঝাঁঝরি-করা পিচকিরি থেকে গোলাপজল ছিটোচ্ছে। মাঝখানে যুগল অশ্ববাহিত বরের গাড়ি। সিংহাসনে বর বসে আছে রাজপুত্রের সাজ সেজে। মাথায় উষ্ণীষ পায়ে নাগরা জমকালো উজ্জল পোষাক। মুখ আবৃত করে ভেলভেটের ঝিলিমিলি আবরণ ঝুলছে। কোনো ধনী অবাঙালীর বিবাহের শোভাযাত্রা।

গ্যাসের উজ্জল আলো উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অন্ধকার আকাশকে অনেক খানি আলোকিত করে তুলেছে। হাওয়ার দরুণ শিখা থেকে থেকে কাঁপছে। ফলে মনে হচ্ছে যেন দোল খাচ্ছে। সেই স্বল্প আলোয় মানস পাশে দাঁড়ান নীলিমার মুখ দেখতে চাইল। কিন্তু নীলিমা ঝুঁকে পড়ে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে মিছিল দেখছে। মানস নীলিমার মুখ দেখতে পেল না। শুধু তার সন্ত সিঁদুর পরা উজ্জল লাল সিঁথি চোখে পড়ল। ইতিমধ্যে চলার বিরতি দিয়ে মিছিল সাময়িকভাবে থমকে দাঁড়িয়েছে। চুমকি বসানো ঝালর দোলান জরির কাজ করা রাজকীয় পোষাক পরিহিত ব্যাণ্ডপার্টির বাদকবৃন্দ বিপুল উৎসাহে চালু হিন্দী গানের সুর বাজাতে লাগল। চোঙা প্যান্ট হাওয়াই সার্ট পরা ক্লারিওনেট বাদকের গাল গলা ফুলে উঠেছে। কোটর থেকে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে বুঝি!

হঠাৎ মিছিলের পিছন দিক থেকে পটকা ফাটানর আওয়াজ ভেসে এল পরপর কয়েকটা। পরক্ষণেই একটা হাউই শিস দিতে দিতে আকাশের অন্ধকার শ্লেটে আগুনের একটা সরল রেখা এঁকে শূন্যে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। উপরে উঠে দুম করে ফেটে গেল হাউইটা, চতুর্দিক আলোকিত উজ্জল হয়ে উঠল। আশেপাশের সব কিছু সামনা সামনি বাড়িগুলোর জানালা বারান্দায় ভীড় করে দাঁড়ান স্ত্রী পুরুষ শিশুদের অদৃশ্য মুখ কিছুক্ষণের জন্য

স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ল। তারপর আলো নিভে গেল। আর মুমূর্ষু হাউই অনেকগুলো লালনীল সবুজ হলুদ তারা কেটে কেটে অন্ধকারের সমুদ্রে আলোর ইসারার মত দুলে দুলে ভেসে ভেসে নীচে নেমে আসতে লাগল।

আবার একটা হাউই উঠল। আর একটা। একটার পর একটা হাউই সোজা সরলরেখায় উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে আবার প্রাচুর্য্যে ফেটে পড়ছে তারপর ক্ষীণ দুর্বল নানারঙের৷ তারা হয়ে খসে যাচ্ছে ঝরে পড়ছে। যে যেখানে আছে প্রতিটি মানুষ উৎফুল্ল ভাবে উর্ধ্বমুখ হয়ে বাজি পোড়ানর এই উজ্জ্বল দৃশ্য দেখছে। থেকে থেকে পরিমণ্ডল আলো থেকে অন্ধকারে অন্ধকার থেকে আলোয় সংকুচিত প্রসারিত হচ্ছে। কোনো উত্তেজিত জ্বরগ্রস্ত মানুষের নাড়ির মত দপ দপ করছে।

বাজি পোড়ান দেখতে দেখতে মানস খুশী হয়ে উঠল। এই জ্বলা নেভা এই আলো অন্ধকার উত্থান পতন তাকে যেন তার অতীত এবং ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অস্তিত্বের একটা বিন্দুতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সে তার সব দুঃখ বিষাদ দুশ্চিন্তা দ্বিধা ও সংশয় ভুলে গেছে। এই মুহূর্তে সে ক্রীড়া-ভূমির বাইরে দাঁড়ান একজন দর্শকমাত্র আর তার সামনে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মত একটার পর একটা হাউই এর উদ্ধত ভঙ্গীতে উঠে গিয়ে নিশ্চিত অবলুপ্তির পথে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। দর্শকের এই ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মানস আনন্দিত সুখী হয়ে উঠল।

সেই আনন্দ ও সুখের অংশীদারের সন্ধানে মানস তার পাশে দাঁড়ান নীলিমার দিকে তাকাল। আর মুহূর্তে মানসের মনে হল পিছন থেকে একটা অজ্ঞাত বিপুল শক্তি যেন তাকে তুলে নিয়ে সামনের সেই ক্রীড়াভূমিতে ছুঁড়ে দিল। আর সকল আনন্দ সকল সুখ পলকে ভঙ্গুর পাত্রের মত চূর্ণ হয়ে গেল। ব্যথিত বিকৃত মুখে মানস নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নীলিমা মুখের মধ্যে আঁচল গুঁজে দিয়ে নিরুদ্ধ নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়েছে। হাউই-এর স্বল্পবায়ু আলোয় মানস দেখল কান্নার বর্হিমুখী চাপ তার সেই আত্মসংযমের প্রয়াসকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। অবিরল অশ্রুধারা নীলিমার গাল বেয়ে নেমে আসছে স্রোতের মত। আবেগে ব্যথায় কষ্টে ব্যর্থতায় নীলিমা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

বিস্মিত হতবাক মানস ক্ষণেক চুপ করে রইল, তারপর অস্ফুটে বলল,—"নীলিমা তুমি কাঁদছ—"

আর সঙ্গে সঙ্গে নীলিমা ছুটে বারান্দা থেকে ঘরে চলে গেল। খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে প্রবলবেগে কেঁদে উঠল। এতক্ষণ যে কান্নাকে সে গোপন রাখতে চাইছিল দমন করতে চাইছিল এখন আর তাকে মুক্ত করে দিতে কোনো বাধা নেই। নীলিমা কান্নার বেগে খাটের বিছানায় মুখ ঘষতে লাগল।

স্তম্ভিত মানস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়। সে স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে পারছিল না। যদিও নীলিমার অসুখ বেদনা শূন্যতাবোধ তার অজানা ছিল না. তবু তার এই অফুরন্ত কান্না যেন অপ্রত্যাশিত। যা করেছে নীলিমা তো স্বেচ্ছায় করেছে, তবে সহসা হতাশার ব্যর্থতার কোন্ উপলব্ধি তাকে এমনভাবে অশ্রুর নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

মানস পায়ে পায়ে খাটের কাছে এগিয়ে এল। এল নীলিমার কাছে। তারপরে সন্তর্পণে একখানা হাত নীলিমার ফুলে ফুলে ওঠা পিঠের উপরে রাখল। মৃদু কণ্ঠে ডাকল, 'নীলিমা—'

সে ডাকে কোনো সাড়া দিল না নীলিমা। বোঝা গেল না শুনতে পেল কিনা। শুধু যন্ত্রণাবিদ্ধ একটা প্রাণীর মত কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠতে লাগল। তখন মানস ঝুঁকে পড়ে নীলিমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে আবার ডাকল, —'নীলিমা। শোন একটা কথা বলি—'

নীলিমা উঠে বসল। তার অনভ্যস্ত সিঁদুর কপালে মাখামাখি হয়ে গেছে। চোখের জলে কপোল চিবুক সিক্ত। কান্না থামিয়ে সে থেকে থেকে শিহরিত হতে লাগল।

মানস কোমল কণ্ঠে বলল,—'কি হল নীলিমা?'

আনত নয়নে নীলিমা পাশাপাশি মাথা ঝাঁকাল। কিছু না!

—'তবে তুমি কাঁদছ কেন?'

নীলিমা একবার শুধু কেঁপে উঠল।

—'তোমার কি বাড়ির জন্ত মন কেমন করছে? বাবা মার কথা মনে পড়ছে?'

নীলিমা সিক্ত চোখে মানসকে দেখল। আবার চোখ নামিয়ে নিল। তারপর অস্ফুটে বলল,—'না।—'

—'তবে?'

—'কিছু নয়। এমনি—'

মানস আবহাওয়াকে তরল করতে চাইল,—'পাগল নাকি! এমনি কেউ কখনো কাঁদে……একটু থেমে মানস কৃত্রিম আহত হওয়ার ভঙ্গীতে 'বলল, আমার কাছে বলবে না নীলিমা? বেশ। তাহলে আমাকে তুমি তোমার সুখ দুঃখের অংশীদার বলে মনে কর না—'

এস্ত চোখে নীলিমা মানসের দিকে তাকাল। তার চোখের দৃষ্টিতে আবেদন ফুটল, বলল,—বিশ্বাস কর, এমন কিছু নয়…ঐ মিছিল দেখতে দেখতে আমার ঠাকুমার কথা মনে পড়ে গেল……'

অকৃত্রিম বিস্ময়ে, মানস অবাক হয়ে গেল,—'ঠাকুমার কথা। সে বুড়ি অনেক কাল হল মরে গেছে।,

—'হ্যাঁ—'

—তবে? আর মিছিল দেখতে দেখতেই বা তার কথা তোমার মনে পড়ল কেন? নীলিমা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে সবকিছু বল। অমন রহস্যময়ীর মত চুপকরে তাকিয়ে থেক না—।' মানসের কণ্ঠস্বরে ঐকান্তিক আবেগ ফুটল।

নীলিমার চোখে বিষন্নতা ঘনাল। সে কিভাবে কি বলবে বুঝতে পারছিল না। অথচ মানস তার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন এখনই শুনতে না পেলে সে মরে যাবে। ব্যাপারটা এত সামন্য এত অবাস্তব নিরবয়ব একটা অনুভূতি মাত্র—

মানস আবার ডাকল,—'নীলিমা—'

তখন নীলিমা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে বলতে লাগল,—জান, ছেলেবেলায় আমাকে পাশে শুইয়ে ঠাকুমা নানারকম গল্প করত, বলত নীলুর বিয়ে হবে, রাজপুত্তুর বর আসবে ঘোড়ার পিঠে চেপে। কত আলো জ্বলবে বাজি পুড়বে বাদ্যি বাজনা……, বলতে বলতে নীলিমার চোখের সামনে বিবাহ সন্ধ্যার কতগুলো আবছা আবছা খণ্ড খণ্ড দৃশ্য ফুটে উঠে মিলিয়ে যেতে লাগল। সখী-জন পরিবেষ্টিত হয়ে বিবাহের সাজে সেজে কনে বসে আছে। কপালে কনে

চন্দন, পরণে বেনারসী, সখীরা কলরব করে কথা বলছে, খিল খিল করে হাসছে। ছোট ছোট মেয়েরা শাড়ি পরে গিন্নিবান্নির মত ভান করছে। বাতাসে লুচি ভাজার গন্ধ। যুঁইয়ের গন্ধ, বেল ফুলের সুবাস। রব উঠল বর এসেছে। শাঁখের আওয়াজ। উলুধ্বনি। নীলিমা যেন সব কটা ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই অসম্ভব সন্ধ্যাটাকে অনুভব করতে লাগল। দেখতে দেখতে তার চোখ আবার ভরে উঠল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলতে পারল,—'আজ আমার বিয়ে হল। অথচ দেখ কি চোরের মত, গোপনে, লুকিয়ে, পালিয়ে এসে— আর বলতে পারল না নীলিমা। অশ্রু যেন তার কণ্ঠকে টিপে ধরল। নীলিমা মানসের বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে দিল।

আর নীলিমার কথা শুনতে শুনতে মানসের অন্তর বাহির যেন হিম হয়ে উঠল। সে দুহাতে নীলিমাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন প্রেরণা পেলনা। বস্তুত নীলিমার কথা শুনতে শুনতে নীলিমার প্রতি একটা গভীর অভিমানে সে আকণ্ঠ। নীলিমার ধারণা যেন শুধু তার একার স্বপ্নই ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু কিছু স্বপ্ন ত মানসেরও ছিল। তার ঠাকুমাও ত কথার তুলি দিয়ে তার শিশু চোখের সামনে স্বপ্নের ছবি এঁকে দিত। মসুর বউ আসবে। রাঙা বউ আসবে। টুকটুকে বউ এসে দাঁড়াবে আর চারিদিক আলো হয়ে উঠবে। দুধের থালায় রাঙা পা রাখবে টুকটুকে বউ আর ছাখ ছাখ তা আলতার থালা হয়ে যাবে। কই সে সব কথা ভেবে মানস ত আজ কাঁদছে না—

নীলিমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতে থাকতে মনে হল, তারা যেন দুই নির্জন দ্বীপবাসী, যে দ্বীপ মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন, চারিদিকে জল-বেষ্টিত। একটা আসন্ন ঝড়ের অপেক্ষায় তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে যে ঝড় হয়ত তাদের দুজনকে দূরে দুদিকে নিক্ষেপ করবে, আরো নির্জনতায় নিঃসঙ্গতায় পৌছে দেবে। আর সেই ঝড়টা আকাশ থেকে নেমে না এসে তাদের দুজনের আলিঙ্গনাবদ্ধ বুকের সংকীর্ণতম উৎস থেকে কোন মুহূর্তে সহসা উঠে আসবে। সশব্দে ফেটে পড়বে।

নীলিমা মানসের বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফুলে ফুলে কেঁদে যাচ্ছিল। না হলে ঠিক বুঝতে পারত কি যেন এক অজানা শংকায় ত্রাসে মানসের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে।

পারস্পেক্টিভ

মদন দাশ

অফিসের ঘর সব সময় বুকে একটা ভারী হাত চাপা দিয়ে রাখে মনে হয়। বাইরে রোদ্দুর যখন সব কিছু ধুয়ে দিয়ে যায় নির্বিঘ্নে তখন কমলের মাথার ওপর ঠায় আলো জ্বলে থাকে। কখনো মেঘ ঘনিয়ে এলে বা অঝোরে বৃষ্টি—কোনো সময়েই আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন নেই। র‍্যাকের ফাঁকে ফাঁকে কাগজের গন্ধ আর টেবিলে ছড়ানো থাকে হাজার বছরের পুরোনো ম্যামির মত হাত।

এই বিবর্ণ হাতে আমি সব কাজ করে চলেছি, কমল ভাবল, অর্থহীন যত কাজ—মৃত্যুর প্রতীক মৃতের মত অসাড় হাতে—অর্থহীন। অথচ আমার এমন কিছু করা উচিত ছিল এই হাতে—উল্লেখ্য—কি রকম? কি কাজ? আমি ঠিক বুঝতে পারি না—মনে হয় সেটা বৃক্ষরোপণের মত কিছু—একদা যা বিশাল হয়ে উঠবে, পাতায় শাখায় ফুলে ফলে, ঘন ছায়ায় ঢাকবে পাদমূল, আশ্রয়ের আশ্বাসের মত ছায়া···। সব কিছু কেমন যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে দিয়ে চলে যাচ্ছে হাত এড়িয়ে···। হাজার বছরের পুরোনো কোন ম্যামির মত হয়ে গেছি, কমল ভাবল, কোথাও কোনো অনুভূতি বেঁচে নেই।

এসব ভাবতে ভাবতে কমল বিভিন্ন টেবিলের পাশ দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে উঁচু উঁচু র‍্যাকের বর্ডার—মাঝে মাঝে গলিপথ—এসবের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ হলঘর পেরিয়ে এসে অবশেষে জানালা পেল। জানালায় ভর দিয়ে কমল বাইরের দিকে তাকাল। বাইরে বৈশাখের খর রৌদ্র ঝন্‌ঝন্‌ করছিল। প্রত্যেকটি পথিক যারা হেঁটে যাচ্ছে অথবা বাসের ট্রামের জানালায় যাদের মুখ অথবা পান সিগারেটের দোকানদার অথবা ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা যত জনের মুখ দেখল কমলের মনে হলো প্রত্যেকেই ক্লান্ত এবং রৌদ্রের প্রতি বিমুখ। বস্তুত এই তীব্র রৌদ্র হ'তে সকলেই যেন কোনক্রমে পালাতে চাইছিল। এতৎ-

সত্ত্বেও কমলের মনে হ'লো এই রোদ্দুরে গা ভাসাতে পারলে ভালো লাগত। এসব ভাবতে ভাবতে কখন অসাড় হয়ে জানলায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কমল, কৌশিক এসে প্রায় তার গায়ের ওপর দাঁড়াল, বলল, আপনার ফোন কমলদা। ওর চোখে হাসি ছলছল করছিল, মুখে হাসি ভেসে যাচ্ছিল।

এই ধরণের কিছু কিছু মানুষ আছে পৃথিবীতে যারা সব সময় খুশী, অতিসহজে সকলকে দাদা বলতে পারে, চন্‌চনে ছটফটে। কমল এখন বুঝতে পারল কে ফোন করেছে, সে কৌশিকের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। তার ভাল লাগছিল না জানালা থেকে অতদূরে টেবিলে যেতে তার ক্লান্তি আসছিল, তথাপি সে একসময় যান্ত্রিক নিয়মমত যেন টেবিলে এলো, রিসিভার হাতে নিলো—কথা না, বলেই রেখে দিলো। কৌশিক প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—দাদা!

এখন মধ্যদিন। রাস্তায় নামল কমল। অফিসে তার ভাল লাগছিল না। আজ আর অফিসে ফিরবে না ঠিক করে ফেলল রাস্তায় নেমেই। অতসী, তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমার আর কিছু ভাল লাগেনা। আমি হাজার বছরের পুরোনো ম্যমি হয়ে গেছি, কমল আস্তে আস্তে বলল।

কোনো কোনো সূর্যাস্ত বেলায় রৌদ্র কেমন উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, অথচ উত্তাপ থাকে না। বিশেষতঃ বর্ষণ শেষের বেলায় সেই সোনার মিনের মতো রৌদ্র তালগাছের মাথায়—দীর্ঘ সব ছায়া ফেলা তালগাছ ঘাসের বুকের ওপর শুয়ে, স্ফূর্তির মত বাতাস সর্‌সর্ করে, অনেক সব গাছপালা ছটফট করে পাখপাখালি নানা শব্দ করে উড়ে উড়ে চলে যায়। সেই সব কৈশোরের গ্রামে ফেলে আসা বৈকাল সহসা একবার কমলের বুক ছুঁয়ে চলে গেল দীর্ঘ ডানা ছড়ানো সাদা বকের মতো। এই শহরের কোনখানে কোনো বিচিত্র বৈকালের মুখচ্ছবি নেই, কমল ভাবল। অথচ কি যেন খুঁজতে খুঁজতে কমল কঠিন রৌদ্রে শহরের পথে পথে ঘুরতে থাকল। দীর্ঘক্ষণ পর মাথার মধ্যে বিস্ফোরণের মত শব্দ এবং যন্ত্রণা অনুভূত হলে কমল সচেতন হ'লো এবং দেখল সে দীর্ঘ সময় ডালহৌসি স্কোয়ারের কয়েকটি পথে বারবার ঘুরছে; তখন সে ময়দানের দিকে হাঁটতে থাকল, তারপর সে গঙ্গার বাতাস পাচ্ছিল, তখন তার পা টলছিল, ঘাসের মাঠে নেমে কমল শুয়ে পড়ল, খুব দ্রুত পরপর

অনেকগুলি বিস্ফোরণের শব্দ তার মাথার মধ্যে—কমলের কষ্ট হচ্ছিল, প্রায় অচেতন অবস্থার মধ্যে তার মনে হচ্ছিল সে একটা মশাল হাতে নিয়ে ঘন অন্ধকারে ঢাকা এক মাঠের মধ্য দিয়ে চলেছে উঁচু নীচু এবড়ো খেবড়ো মাঠ, পথ নয়, পা পড়ছে এলোমেলো আর অনেক দূরে দূরে গ্রামের আভাস, সে ঐ গ্রামগুলির কোন একটিতে পৌঁছাতে চাইছিল কিন্তু পারছিল না শুধুই ঘুরছিল কমল, শুধুই ঘুরছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কমল এবং শান্ত হতে চাইল…।

সন্ধ্যাকাল। বাড়ী পৌছল কমল। বাইরের ঘরে আলো। নন্তু—ছোট ভাই—নবম শ্রেণীর ছাত্র - উচ্চৈস্বরে অধ্যয়নরত—কমল কাহিনীটি অনুধাবন করছিল—সমুদ্রে উত্তাল সব ঢেউ। ছোট্ট মেয়ে কাঁদছিল, মাঝিকে বাপ শুধায় কেমন করে শান্ত হবে ঢেউ—ইত্যবসরে কমল ঘরে ঢোকা মাত্র নন্তু চিৎকার করে উঠল,—দাদা আনন্দদা মারা গেছে। ওপাশে রান্নাঘর থেকে মা চেঁচিয়ে উঠল—আঃ! ঘরে আসতে না আসতেই—একটু জিরুতে দে—শেষে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে মা থেমে গেল। কমল ঠিক বুঝতে পারছিল না। তার মাথা পুনরায় ঝিমঝিম করে উঠল। মা এগিয়ে এসে—আর ব্যস্ত হবার কিছু নেইরে, সে সব গত রাত্রে ঘটে গেছে। তুই জামা কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নে। সমরেশ ব'লে একটি ছেলে এসেছিল খবর দিতে—বলে মা তিন বার আহা আহা বলল।

আনন্দ মফঃস্বলের এক স্কুলের শিক্ষক ছিল। হোস্টেল-এ থাকত। তার বাল্যকালের বন্ধু আনন্দ। বাবা মা মারা যাওয়ার পর সংসারে সে একা ছিল। গতকাল রাত্রের শেষে সে সহসা অদ্ভুত বুকচাপা আওয়াজ করে উঠেছিল এবং ঘরের অপর সহবাসী সমরেশ তাকে অসহজ অবস্থায় দেখে সকলকে ডাকাডাকি করে—ডাক্তার ডাকে—কিন্তু তখন আনন্দ মৃত। মুহূর্তে নিশ্চিত নিদ্রার মাঝে মৃত্যু সত্বেও তাকে লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে। কাঁটাপুকুর নামক কোন এক জায়গার মর্গে। আগামীকাল সকালে সেখানে কমলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলে গেছে সমরেশ।

সবকিছু শোনার পর কমল হাতমুখ ধুয়ে পাজামা পরল- চা ও খাবার খেল. টেবিলে পা তুলে পাখা চালিয়ে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসল এবং

তারপর রাত্রি হলো, তারপর কমল রাতের খাওয়া শেষ করে ঘুমুতে গেল।

খুব শীঘ্র সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সম্ভবতঃ সে খুব ক্লান্ত ছিল··· তারপর অনেক রাতে কমল এবং আনন্দ, বন বাদাড়ে দাপাদাপি ঝড়, শীত বাতাস, তারা দুজনে বাঁশবনে পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে গা গরম করছিল, সহসা আগুন নিভে গিয়ে চতুর্দিক ধোঁয়ায় ভরে গেল, কমল দেখল আনন্দ ধোঁয়ার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে ডাকতে চাইল, কিন্তু তার কণ্ঠ শব্দ করতে পারছিল না—আনন্দ কেঁদে উঠল,—কমল ওরা আমার শরীর চিরে ফেলবে বলছে—।— কারা? কারা? কমল আবার চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু তার কণ্ঠনালী কে যেন কেটে নিয়েছে, সুতরাং কমল ছটফট করে উঠল—তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে গভীর অন্ধকার—সমস্ত পৃথিবী শূন্য—এই বিশাল শূন্যতায় গভীর অন্ধকারে একাকী কমল অসহায় বোধ করছিল··· ।

একদিন কমল একটি পত্রিকায় একটি গল্প পড়ছিল। পড়তে পড়তে তার মনে হ'লো, গল্পের মধ্যে নানা কথায় সে খুঁজে পাচ্ছে সেই সব শৈশব কৈশোরের বাক্সে তুলে রাখা গরমের পোষাক যেগুলি এখন মাপে আশ্চর্যরকম ছোট মনে হয় অথচ হাতে নিলে গন্ধ নিলে কেমন যেন ছুটোছুটি করে আসে সেই ফেলে আসা বাল্যকালের পৌষের সকাল—উষ্ণ মিঠে রোদ্দুরে পুকুরের জলে ঝিলমিল আলো, খেজুরের গুড় মাখা মুড়ির গন্ধ, এমনকি চিট্‌চিটে আঙুল পর্যন্ত—যেন এইতো আছে কাছাকাছি কোথাও আড়ালে —এ গল্পটি তার নিজেরই ছোটবেলার গল্প মনে হচ্ছিল, তখন তার আনন্দকে মনে পড়ল এবং সে আশ্চর্য হয়ে গেল যখন দেখল লেখকের নাম আনন্দ সান্যাল। অতঃপর পত্রিকার অফিসে গিয়ে সে লেখকের নাম ঠিকানা জোগাড় করল।

এক ছুটির দিন দুপুরে কমল সেই ঠিকানায় পৌঁছাতে এক মফঃস্বলের বাসে চাপাল। তখন বসন্তকাল, দুপুরের রৌদ্র ঈষৎ উষ্ণ, পড়ন্ত বেলায় কমল যেখানে পৌঁছাল সেটা শহরের গন্ধলাগা একটি গ্রাম এবং আনন্দকে পাওয়া গেল। একটি ছোট ছেলে দেখিয়ে দিলো আনন্দকে। এক

কৈশোরের গুটি থেকে বেরিয়ে যাওয়া দুই যুবক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীর্ঘ পনেরো বছর পর পরস্পরের সত্তা অনুভভব করতে চাইল।

দুই বন্ধু কি কথা বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না। পড়ন্ত বেলায় তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পুকুরের পাশ দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার ইঁট ঢাকা, পুকুরের জলে আশ্চর্য গলিত রৌদ্র ভাসতে দেখল কমল, অশথের পাতায় উথলে পড়া খুশী দেখল কমল, ক্রমশঃ তারা গাছগাছালি ঢাকা পাখপাখালি ডাকা এবং ঝিঁঝিঁর শব্দ পূর্ণ এক নির্জনে সরু পথ দিয়ে নদীর ধারে পৌছাল। ঘাটের রানায় পা ছড়িয়ে বসে তারা অনেকক্ষণ চুপচাপ সময় কাটাল। কমল দেখছিল শীর্ণ অপুষ্ট এক যুবক অথচ কি আশ্চর্য উজ্জ্বল দুই চোখ। আনন্দ দেখছিল আকর্ষণীয় সুন্দর এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তার বন্ধু অথচ কি আশ্চর্য ম্রিয়মান দৃষ্টি! সেদিন তারা দুজনে কেউ কোনো কথা বলল না। ভাঙা ঘাট, জলের শব্দ, অলস নৌকা, পাখীর কিচিমিচি তাদের নৈঃশব্দ পূর্ণ করছিল।

মধুর বাল্যকাল। চিত্রিত কৈশোর। দুই বন্ধু দেশ—বিভাগের বীভৎস উৎসবে বিচ্ছিন্ন। কত দিন ধরে কত দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। সেই মুখ চোখ হাসি অভিব্যক্তি পরিবর্তিত। দুই মানুষ—তাদের আবার নতুন করে বন্ধুত্ব করতে হবে। তবু কোথায় যেন কি আছে। কোন অদৃশ্য সময় স্থির ছিল সঙ্কেতের অপেক্ষায়, সুতরাং আলোকের রশ্মি এসে পড়ে।

শেয়ালদা স্টেশনের চরমতম দিনগুলির কথা বলেছে আনন্দ। তারপর বস্তি—অন্ধঘর কুণ্ঠিত আলো—অচ্ছুৎ বাতাস—আকাশের কোন রঙ নেই—জীবনের কোনো বাতায়ন নেই—মা শীর্ণ - বাবা জীর্ণ ক্লান্ত – তবুও ক্ষুধা—সুতরাং—তারপর এবং—প্রচেষ্টা— দিন মাস বৎসর— চলে যায়—কেমন করে চলে যায় ঠিক—আরও কত নিকৃষ্ট ভাবে বাঁচবে অমৃতের পুত্র মানুষ! কি জন্য বেঁচে আছো? কেন বেঁচে আছো? কি নিয়ে বেঁচে আছো? শুধু বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে আছো! সারাদিন বাসন মেজে মেজে মায়ের হেজে যাওয়া হাত, বাবার রোগাক্রান্ত কোটরাগত চোখ অর্ধাহার ক্লিষ্ট জীর্ণ দেহ-এবং মৃত্যু—এবং শেষ এবং শান্তি। সমগ্র পরিবারের খাদ্য খেয়ে বেঁচেছিল শকুনি—প্রতিশোধের জন্য—দুইজন মানব মানবীর মৃত্যুদূত—আমি কে বেঁচে আছি?

কেন বেঁচে আছি ? এই বিশাল পৃথিবী—আহা সুন্দর পৃথিবী—আমি কি তোমার ওপর প্রতিশোধ নেব বলে বেঁচে আছি ?

···তবু আমি বাঁচতে চাই কমল। এই আশ্চর্য পৃথিবীর জন্য বাঁচতে চাই। এই আশ্চর্য মানুষের জন্য বাঁচতে চাই। এই আশ্চর্য আমার জন্য বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাই কমল···।

ক্রমশঃ কমল অনুভব করছিল তার জীবন থেকে কি যেন হারিয়ে গেছে। সেটা কি ? কি সেটা কমল বুঝতে পারছিল না।

তুলনামূলক ভাবে কমল তো অনেক সুখী। মোটামুটি স্বচ্ছল সময়—স্কুল, কলেজ, তারপর চাকুরী—অভাবের আঁচ গায়ে লাগেনি—ছোটখাট বাড়ী—ব্যাঙ্কে কিছু টাকাও রেখে গেছেন বাবা—এরপর একটা বিয়ে—আনুসাঙ্গিক—সন্তান পালন—বেবিফুড—অয়েলক্লথ—দোলনা—এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ—এইতো অতসী—সুন্দর মুখ, সুন্দর দেহ—অথচ আমি এক ম্যমির মত—ম্যমির মতো আমি পিরামিডের নীচে—আলোর উৎসগুলি বন্ধ--ঠিক! আলো! কোথায় যেন একটা বন্ধ জানালা আছে, মনে হয় খুললেই—আলো রোদ্দুর উদ্ভাসিত শিহরিত—অঙ্কুরোদ্গমের কি কোন মন্ত্র আছে ?

ভোর হয়ে আসছিল। কাকের কর্কশ শব্দ শুনল কমল। বিছানার এপাশ ওপাশ করে তার পিঠ ব্যথা করছিল। আনন্দ বড় সজীব ছিল। আনন্দ বড় তিরস্কার করত কমলকে। সে তার প্রতিটি অনুভূতির স্বাদ কমলের অনুভূতিতে সঞ্চারিত করতে চাইত। নতুন বন্ধুত্বে আনন্দ বড় ভালবেসেছিল কমলকে। মাঝে মাঝে সে দুঃখ প্রকাশ করত, কষ্টবোধ করত নিস্পৃহ নির্মম অনুভূতিহীন কমলের জন্য। একদিন সে অতসীকে নিয়ে এলো —তার মামাতো বোন, কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে থাকে। গরীব ঘরের শান্ত সুন্দর মেয়ে এবং চুপিচুপি বললো,—তোমাকে একটি দুর্লভ পুষ্পোদ্যান উপহার দিলাম।—অতসী তুমি কি জানো আনন্দ মারা গেছে ? কথাটা বিড়বিড় করে বলল কমল। তার কেমন হাসি আসছিল। সে ফুঃ ফুঃ করে দুবার শব্দ করল এবং বিছানা থেকে নামল। একটা বেড়ালছানা ঘরের মেঝেয় গুটিগুটি ঘুমাচ্ছিল, কমল তাকে এক লাথি মারল।

কাঁটাপুকুর কোথায় কমল জানেনা। সেখানে লাশকাটা ঘর কেমন কমল

জানেনা। তবু কমল সকালের রোদে গা পুড়িয়ে একসময় সেখানে পৌঁছাল। সমরেশ সেখানে উপস্থিত ছিল এবং আনন্দর আরও কয়েকজন সহকর্মী ও প্রধান শিক্ষক। প্রায় বেলা দশটা পর্যন্ত তারা সেখানে চুপচাপ অপেক্ষারত।

কেমন অর্থহীন অপেক্ষা। মস্তিষ্কের মধ্যে কোন চিন্তা নেই শুধু এক মৃত-দেহ। কখনো দাঁড়িয়ে কখনো বসে কমল ভাবতে লাগল—মৃত দেহ—দেহ মৃত—অমৃত পুত্র আনন্দ—বাঁচতে চাই আশ্চর্য্য আমার জন্য, অথচ মৃত—আশ্চর্য মৃত আনন্দ—কতশত মানবপুত্র ঠিক ঠিক বেঁচে, আনন্দ মৃত—বেশ বেশ—বড় বাঁচতে চেয়েছিলে এখন দেখো সবাই এসেছি তোমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবো, দেখি কি করে পালাও—আচ্ছা আগে কেটেকুটে ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখে নিই কোথাও লুকিয়ে আছো কিনা। কমলের খুব হাসতে ইচ্ছে করছিল। ডোমেদের এক ন্যাংটো বাচ্চা ঘুর ঘুর করছিল, কমল তার পেটে ক্যাঁক করে চিৎকার করে উঠলে কমল হো হো করে হেসে উঠল, সকলে সচকিত হয়ে ওঠার মুহূর্তে যমদূতের মত একটি লোক জানাল বিকালের আগে লাশ পাওয়া যাবে না।

সেই দূর মফঃস্বলে ওরা এখন ফিরে যাবে না ওরা আলোচনা করছিল কোথায় যেন ওরা বিশ্রাম করবে, চান খাওয়া করবে। কমল হাঁটতে শুরু করল। এখন বাড়ী যেতে হবে, ভাবল সে। সুতরাং সে বাড়ী যাচ্ছিল। বাড়ী একটা অভ্যাস, কমল ভাবল। কোন বাস ট্রাম দাঁড়াচ্ছিল না। দুরন্ত ভীড় দেখে কমলের মনে হলো এটা অফিসের সময়। আজ আমি অফিস গেলাম কেন? একটা কাজ রয়েছে। কোনদিন কি এরকম হয়েছে শুধু শুধুই আমি অফিস গেলাম না? হয়নি। একটা কারণ না থাকলে আমরা অফিস যাবই। অফিস একটা অভ্যাস, কমল ভাবল। একটা মৃতদেহ সংকার—একটা সংস্কারের অভ্যাস—ভাবতে ভাবতে কমল হাঁটতে থাকল।

অনেক রাস্তা ধরে কমল হেঁটে চলল। কখনো ট্রামলাইনের ধার দিয়ে কখনো ফুটপাথ দিয়ে, কখনো রাস্তা পেরিয়ে এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছিল সে। এক সময় একটা চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে তার মনে হ'লো এখানটা তার চেনা। ফুটপাথের ওপর বাঁধানো ছাদসহ বাসস্ট্যাণ্ড। একটি অত্যন্ত জীর্ণ শরীর নারী অথবা পুরুষ কিছু একটা হ'তে পারে—উপুড় হয়ে পড়েছিল। তার কোমড়ে জড়ানো ঐতিহাসিক কাপড়ের ছিন্ন টুকরোর পাশ দিয়ে

ক্ষীণ জলধারা গড়িয়ে গেছে. মাছি থিক থিক করছিল। শরীরটার চামড়াঢাকা হাড়গুলি ঈষৎ ওঠানামা করছে। কমল দাঁড়িয়ে থাকল। অনেক নারী পুরুষ দাঁড়িয়ে থাকল, তারা অপেক্ষারত বাস অথবা ট্রামের—কমল তাদের প্রত্যেকের কোমরে একটুকরো জীর্ণ ক্লেদাক্ত বস্ত্রাংশ জড়িয়ে দিলো এবং প্রত্যেককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল এবং এই মুহূর্তে এটাই তার একমাত্র করণীয় বলে মনে হচ্ছিল। সে প্রত্যেকটি নারী পুরুষের জামা কাপড় খুলে নিল, শরীরের অতিরিক্ত মাংস মেদ রক্ত এবং ঔজ্জ্বল্য তুলে নিয়ে সে তাদের প্রত্যেকের কোমরে একটুকরো জীর্ণ ক্লেদাক্ত বস্ত্রাংশ জড়িয়ে দিলো এবং প্রত্যেককে ফুটপাথে শুইয়ে দিল। খানিকক্ষণ সেইভাবে রেখে দিয়ে সে বহুযুগ অপেক্ষা করল তারপর পরিত্যক্ত পৃথিবীতে কয়েকটি জীর্ণ কঙ্কাল শায়িত ছিল।

হাঁটতে থাকল কমল। এখন সে একটি অত্যন্ত নির্জন রাস্তা পেয়ে গেল। অত্যন্ত পরিষ্কার পথ, কালো চক্‌চকে দুপাশে উঁচু নানান ধাঁচের পাঁচিল ঘেরা নিঝুম সাজানো গোছানো বাড়ী সব উদ্যান পরিবেষ্টিত। একটি উদ্যানের ভেতর থেকে ঝুঁকে আসা একটি বিরাট গর্বিত গাছ হলদে ফুলে ছেয়ে আছে। তার এলাকায় সমস্ত পথে হলদে ফুলের আচ্ছাদন। কমল খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। সে পা দিয়ে ঘসে ঘসে কিছু ফুল রাস্তায় মাখিয়ে দিলো এবং একটা পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করল।

হাঁটতে হাঁটতে নির্জন পথের শেষে সে একটি সেতু পেয়ে গেল। ছোট্ট সেতু। নীচে পুণ্যস্রোত আদিগঙ্গা প্রবাহিত বুঝতে পারল কমল। সেতুর পাশে একটা বিরাট খাটাল। কয়েকটি মহিষ কাদায় গোবরে গা ডুবড়ে নাক উঁচিয়ে বসে অথবা শুয়ে। সমস্ত জায়গাটি কেমন কর্দমাক্ত। বাতাসে উৎকট একটা গন্ধ—কমল বেশ তৃপ্তি অনুভব করল। ওদিকে জলের ধার ঘেঁষে কয়েকটি শকুন বীভৎস ঘাড় আর ঠোঁট উঁচিয়ে নড়াচড়া করছিল, সে সহসা সেদিকে তাকিয়ে ভীত হ'য়ে পড়ল এবং হাঁটতে থাকল। তারপর একসময় সে দেখল হাজরার মোড়ে পার্কের পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে। সে যথেষ্ট ক্লান্তি অনুভব করছিল। মাথা ঝিমঝিম করছিল সুতরাং সে চোখ বুজল এবং রেলিং এ হেলান দিয়ে দাঁড়াল, সহসা তার চারপাশে কারা জলন্ত মশাল নিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলো।

কমল তাদের কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিল না, শুধু কতগুলি হাত, কতগুলি মশাল ধরা মুঠো মুঠো হাত। সামনে দাঁড়ান দীর্ঘ দেহ এক শিরীষ গাছের সমস্ত শরীরে তারা আগুন লাগিয়ে দিলো। মাথার মধ্যে আগুনের উত্তাপ দপ্‌দপ্‌ করছিল, চোখ ফেটে যাবে মনে হচ্ছিল, জলন্ত গাছ তার দিকে ঝুঁকে আসছিল, কমল আঙুল দিয়ে দুচোখের পাতায় চাপ দিলো, দুগালের ওপর দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল, কমল হাত দিয়ে স্পর্শ করল এবং দেখতে চাইল, কিন্তু সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না…।

আগুন নিভে আসছিল। কে যেন কমলের হাত ধরে আলতো ঝাঁকুনি দিলো। চোখ খুলে কমল দেখল সামনে একটি শিশু দাঁড়িয়ে, তার গায়ে বয়স্কের জামা, জামার ঝুল তার পায়ের পাতা ছুঁয়ে লট্‌পট করছিল এবং জামাটা যদিও হাফ্‌ হাতা তথাপি সেটা তার গোটা হাত ঢেকে দিয়েছে। শিশু সেই হাত তুলে কমলের কাছে কি যেন চাইল, কমল তার বিবর্ণ চোখ শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল আনন্দ শৈশবের দেহ নিয়ে বার্দ্ধক্যের জামা গায়ে দিয়ে তার সামনে হাত পেতে কি যেন চাইছে। সে তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল—কি চাই? তারপর নিজের কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকল। কমল তার চারপাশে জনস্রো'ত ফেলে হাঁটছিল। কমল বাড়ী যাচ্ছিল…।

ঘরে ফিরল কমল। হাতে জট পাকানো সুতোর এক লাটাই নিয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা করেছে সে সুতোর জট খোলার জন্য এরূপ একটা অনুভব তার মাথার মধ্যে ছিল। ঠিক অনুভব তার মাথার মধ্যে ছিল। ঠিক অনুভব ছিল বলা যায় না,—একটা হাবজি-গাবজি ভাব যেন কিলবিল করছিল যার মধ্যে ঠিক কোন চিন্তা সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হচ্ছিল না। প্রায় বোধশক্তিহীন সচল মনুষ্য আকৃতি কোন এক যন্ত্রের মতো সে ঘাড় ফিরাল।

দীর্ঘক্ষণ ধরে স্নান করল কমল। কূপের ঠাণ্ডাজলের যখন প্রথম স্পর্শ রাখল সে শরীরে তখন তার শরীর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সচকিত হয়ে উঠল। মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল কিছু যেন ভেসে চলে যাচ্ছে তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে, গড়িয়ে পড়ছে কোনো বদ্ধ রক্তের মতো কিছু এবং সে আরাম বোধ করছিল।

ফুলকাটা আসনে বসে পরিপাটি ভাবে ভাত খেল কমল। হঠাৎ পাতিলেবুর গন্ধ তার খুব ভাল লাগছিল। খাওয়া শেষ করে পরিতৃপ্ত ভাবে সে জল পান করল।

পাশের বাড়ী রেডিওতে পরপর একই কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত বেজে চলেছে, বালিশে মাথা রেখে গভীর মনোযোগে গান শুনছিল কমল, একসময় সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

এক সুন্দর অরণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কমল। দুপাশে দীর্ঘ দেহ গাছ—সুন্দর। গাছেদের পাতারা বড়ো ব্যস্ত বাতাসের সাথে, কথা বলার শব্দ মর্‌মর্‌, রৌদ্রের অজস্র টুকরো মুঠো মুঠো ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশে অনাবিল হাসির মতো, বাতাস বকুলের গন্ধ মৌ মৌ, বড়ো উদাস লাগে, তার বুকের মধ্যে কেমন ঢেউ উঠছিল; বড়ো ভাল লাগছিল কমলের···।

বিকালে যখন ঘুম ভাঙল কমলের নিজেকে তার খুব হাল্‌কা মনে হচ্ছিল, কোন গ্লানি নেই, কোথাও কোনো যন্ত্রণা নেই এবং তার বুকের মধ্যে গভীর প্রার্থনার মতো কিছু অনুরণিত হচ্ছিল। মুখ হাত ধুয়ে পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবী পরল কমল, পরিপাটি মাথা আঁচড়াল এবং রাস্তায় নামল···।

বাঁশের একটি ফ্রেমের ওপর নতুন বস্ত্রখণ্ড জড়ানো আনন্দর দেহ শায়িত। কিছু ফুল সাজিয়ে দেওয়া হলো আর শরীরের দুপাশে, আনন্দর চোখের পাতা ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে—অক্ষিগোলক সামান্য যেন চিকচিক করছিল, খুব ছোট লাগছিল আনন্দর দেহ—একটি কিশোরের দেহ যেন, সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একসময় কমলের বুক উথাল পাথাল করে উঠল। আনন্দর দেহের পাশে হাঁটু-মুড়ে বসল সে, তার দু গাল অশ্রুধারায় ভেসে যাচ্ছিল।

ইলেকট্রিক চুল্লির মুখ খুলে গেছে, কমল দেখল এক গভীর আলোর রাজ্যে আনন্দ নিশ্চিন্তে চলে যাচ্ছে, চোখ বুজে কমল চিৎকার করে উঠল—ঈশ্বর এক মুঠো রোদ্দুর দাও—

বিশাল হলঘরের দেওয়ালে, থামের খিলানে খিলানে কমল আনন্দর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে শুনল—এক মুঠো রোদ্দুর দা-আ-ও···।

মানুষ ও চড়ুইদের গল্প

মলিন দত্ত

ঘটনাটা ঘটেছিল আকস্মিকভাবে।

একটা বিচ্ছিরি রকমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল ওসমান। বেমক্কা এমন একটা কাণ্ড হঠাৎ করে বসবে তা ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই প্রথমটায় বুঝতেও কষ্ট হচ্ছিল। কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল সব। তার মাথায় হাতুড়ীর ঘা পড়ছিল। শিরা দপ্ দপ্ করছিল। কপালের ঘামে তেলচিটে গন্ধ— ওসমান সময়ের পেছনে ছুটছিল।

অথচ সকালে যথারীতি সূর্য উঠেছিল। একটু একটু বাতাস ফুল গাছ ও লতাপাতায় মৃদু শিহরণ তুলছিল। দিনের প্রথম, তাই পৃথিবীর যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুরু হয়েছিল রোজকার মত। তাছাড়া বেশ মনে করতে পারছে যে সে গত রাত্রে খুব ঘুমিয়ে ছিল। ভাল ঘুম হয়েছিল বলে মনটাও ভাল ছিল—অর্থাৎ একটা খুসি খুসি ভাব। বার দুই হাই তুলে বিছানা ছেড়ে উঠেছিল এবং একটা গানের কলি ঠোঁটের ডগায় নাড়াচাড়া করতে করতে পথে পা দিয়েছিল। পরে একটা বড় দোকানে ঢুকে বেশি পয়সা খরচ করে এক কাপ চা খেয়েছিল সাথে সিগারেটের ধোঁয়াও।

এসব প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা স্রোতের গতি আজ এই অফিস ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে এসে থমকে দাঁড়ালো। একটা নিদারুণ ছন্দপতন হলো যেন। কিছু সময় ওসমান কন্ট্রোল রুমের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কতক্ষণ, এখন আর অনুমান করা যাচ্ছে না। বাইরে চেঁচামেচি, শুরু হয়েছিল···উত্তেজক কথা কাটা-কাটি। হেড ক্লার্ককে ঘিরে অনেকগুলি মাথা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ক্লার্কবাবু হাত তুলে কি সব বলছেন। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কেবল হিজি-বিজি কলরব।

গোডাউনের দিকের দরজা খোলাই ছিল। দু-এক জন সে দিকে ছোটা-ছুটি করছে এবং একে আর একজনের দিকে দু একটা কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে। সে সব কথাবার্তা এত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট যে ওসমান দু একটা লুফে নিতে গিয়ে

ব্যর্থ হলো। বস্তুতঃ তার সেদিকে বিশেষ আগ্রহও ছিল না। তার মন এখন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে আর দুলছে আর দুলছে! কিছুতেই স্থির করতে পারছে না। পাশের ঘরে ওয়াটার কুলারের বেসিনে টপ্ টপ্ জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। সে শব্দ তার কানের মধ্যে দিয়ে বুকের পাঁজরে মোচড় দিচ্ছে। টন টন করছে বাঁ দিকটা। সময়ের আবর্তে তার সমস্ত সত্বা ঘুরপাক খাচ্ছে।

বড় সাহেবের ঘরে কলিং বেল বাজছে মুহুর্মুহু। পিয়ন আর্দালীরা ঢুকছে আবার বেরিয়ে আসছে। সকলের মুখ গম্ভীর একটা উৎকণ্ঠার ছায়ায় ঢাকা। এসব এখন তার কাছে অস্পষ্ট কেমন ঝাপসা মনে হচ্ছে। মনটাকে শক্ত করে বাঁধা চাই। পা দুটো শক্ত করে মাটিতে রাখল সে। দুহাত বুকের মধ্যে রেখে ঘাড় বাঁকিয়ে ওপরের দিকে তাকালো ওসমান। কটা বেজেছে কিছুই অনুমান করা যাচ্ছে না।

সন্ত বার্নিস করা কাঠের পার্টিশনগুলি থেকে একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ তার নাকে লাগছে। একটা মাদকতা আছে এ গন্ধে। হঠাৎ তার কাঠের মিস্ত্রিদের কথা মনে পড়লো—তার পরেই টাঙ্গিখানার কথা। সে একবার ভাবতে চেষ্টা করলো টাঙ্গিখানা কোথায় ফেলেছে। কষ্ট করে মনে করতে পারলো যে সে টাঙ্গিখানা কলঘরেই ফেলে এসেছে।

কিন্তু এখন কি করবে তা ওসমান কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছে না। কি করা উচিত! হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড করে বসবে তা যেন কিছুক্ষণ আগেও সে ভাবতে পারে নি। একটা জান্তব আক্রোশ তাকে গ্রাস করেছিল। অনেকটা খুনে পাওয়া মানুষের মত। খুনে পেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। অন্য কিছু। নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ওসমানও তাই। কিন্তু তার জন্য তার কোন আক্ষেপ নেই। অনুতাপ করতে ইচ্ছে করছে না। বরং তার একবার মনে হয়েছে সে এখন মুক্ত, অনেক হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে। ইচ্ছে করলে উড়তে পারে আকাশেও।

তবু একটা পরিণাম চোখের সামনে ভেসে উঠছে বার বারই। একটু বাদেই হয়তো ডাক পড়বে। একটু দেরি হলে গোটা দুই দেশওয়ালি দারওয়ান তার ঘাড় ধরে নিয়েও যেতে পারে বড় সাহেবের ঘরে। ধাক্কা দিয়ে ওরা হয়তো তাকে সাহেবের পায়ের কাছে ফেলে দেবে; তেমন হলে কি

করবে ওসমান! পা জড়িয়ে ধরবে সাহেবের? ছ'চোখ জলে ভাসিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়বে? বলবে?—"এবারের মত ক্ষমা করে দিন। জীবনে আর কখনও করবো না, কোন দিন না।"

"না—না—না···।" হঠাৎই চিৎকার করে উঠেছিল ওসমান। বিকট শব্দ করে গলা থেকে কথা কটি বেরিয়ে এসেছিল তার। নিজের অজান্তেই মনে তার বিদ্রোহ ঘোষণা। কিন্তু সমস্ত অফিস যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কেমন বোবা বোবা। সব জটলা আর কলরব থেমে গেছে মুহূর্তে। সব মিলিয়ে শোক বিহ্বল ভাব। অনেক চিন্তা আর অনেকগুলি সতর্ক দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু এখন ওসমান। দারুণ অস্বস্তি লাগছে তার। একটা নিষ্ঠুর প্রহসনের খেলা চলছে তাকে ঘিরে। কপালের ঘাম মুছে পা দুটো শক্ত করে মাটিতে রেখে দাঁড়ালো সে। চোখ দুটো বন্ধ করে ভাবলো মুহূর্ত।

অনেক দূর থেকে একটা ঠুক্ ঠুক্ শব্দ যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। সে ইচ্ছে করেই চোখ না খুলে শব্দটার গতি অনুধাবনের চেষ্টা করছিল। ধীরে ধীরে সে শব্দটা এক সময় তার ঠিক সামনে এসে থেমে গেল। চোখ মেলে ওসমান "থ" বনে গেল। তার গলা শুকিয়ে আসছে। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। তবু সে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলো। ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে উঠলো—কিন্তু শব্দ বের হলো না। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে উঠেছিল। কি করবে সে! এই মুহূর্তে কি করা উচিত কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। নিজের সমস্ত অনুভূতি যেন সে হারিয়ে ফেলছে। একবার মনে হয়েছিল তার দৌড়েই পালানো কর্তব্য। অথচ পা দুটো তুলবার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছিল।

বড় সাহেবের গলা শোনা গেল। গম্ভীর এবং সংক্ষিপ্ত—'এস আমার সঙ্গে।' বলেই হাঁটতে লাগলেন তিনি। যেমনভাবে এসেছিলেন ঠিক তেমনি ধীর, দৃঢ় পদক্ষেপে। ওসমান তার পিছনে হাঁটতে শুরু করলো। বস্তুতঃ সে যেন হাঁটছিল না মোটেই। পেছন থেকে কেউ যেন তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।

তারপর বড় সাহেবের ঘরে এক কোণায় একখানা ছোট টুলে তাকে বসতে বলা হলো। ওসমান বসলো। সাহেব বসলেন পুরু গালিচা পাতা হাতল-তোলা চেয়ারে। ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে পকেটে হাত

ডোবালেন। লাইটার জেলে সিগারেট ধরালেন এবং বার কয়েক রিং বানিয়ে একটা পরিতৃপ্তির হাই তুললেন। তারপর এক সময় সাহেব ওসমানের দিকে চোখ ফিরিয়ে স্থির ভাবে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। পরক্ষণে সেলফ থেকে এক গাদা ফাইল পত্র টেনে নামালেন। উলটে-পালটে পরীক্ষা করতে লাগলেন সব। কলিং বেল টিপলেন। আর্দালি এল। কেরাণী বাবু'র ডাক পড়লো। স্টেনোগ্রাফার এলো। সাহেব টেবিলের উপর ঝুঁকে বক্তৃতা শুরু করলেন। সে সব ওসমানের মাথায় ঢুকলোনা কিছুই। ঢোকাবার ইচ্ছাও তার ছিল না। কেননা তার সারা গা কেমন গুলিয়ে গুলিয়ে উঠছিল। বমি বমি লাগছিল। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো যেন। থুতু ফেলতে ইচ্ছে করলো। আসলে কিছুই করলো না। পেটের মধ্যে হাত রেখে সে সাহেবের মুখের ওপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল একবার। এসব অর্থহীন উদ্‌ভট পাঁচ মিশেলি ব্যাপারের মধ্যে বড় সাহেবের বিরাট মুখখানা কেমন ঝাপসা অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। স্টেনোগ্রাফারের কলম দ্রুত নোট বই'র ওপর ঘুরে চলছে। এখানে ওসমানের কোন ভূমিকা নেই। তবু সে বসে আছে। তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে বলে সে আছে। সে কেবল ভাবছিল সময়ের গতির কথা। পৃথিবীটা ঘুরছে না থেমে আছে কোথাও!

সমস্ত ঘটনাগুলি সময়ের কাঁধে পা রেখে এমনভাবে এগুচ্ছিল যে ওসমান কিছুতেই অনুসরণ করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল সবই প্রহসন। আসলে যে যা ছিল তাই আছে। কেবল সময়ের সাথে তাল রাখতে পারছে না বলে কেমন এলো মেলো হচ্ছে সব। এসব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনা নাড়া-চড়া করতে করতে ওসমান স্মৃতির গভীরে ডুব দিল।

ব্যাপারটা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। মনটাকে শক্ত করে স্মৃতির দড়িতে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে ফেলা চাই, যাতে না একেবারে নড়তে চড়তে পারে। ব্যস্। আর অস্পষ্টতা নেই। চোখ জ্বালা নেই। মাথায় টন্ টন্ অথবা শিরাগুলির দাপা-দাপি নেই।

কেমন সজীব আর প্রাণবন্ত ওরা। নতুন শীতের হিমেল বাতাসের স্পর্শে ফুলে ফুলে উঠছে। আবার সোনালী রদ্দুরে স্নান করে দেহ-মন হাল্কা করে নিচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে, উড়ে বেড়াচ্ছে, যেখানে খুসি বসছে—গান গাইছে।

গরমের দিনে ওরা এদিকটায় আসে না। কেননা সে সময় এখানে ক্লান্তির উত্তাপ আর নানা অসুবিধা। সবচেয়ে বড় অসুবিধা প্রতি পদে বিপদের ফাঁদ পাতা। একটু অসতর্কতা মানে মৃত্যু। শিকারীর জাল দিয়ে ঘেরা সমস্ত পথ। তাই অক্টোবরের মাঝা-মাঝি আসা, ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বিদায়। মাঝখানে একটু বিহার।

বেশ কাটে ওদের দিনগুলি। কানে মাথায় বাতাস লাগিয়ে উড়ে যাওয়া। যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ। সাদা-কালোয় মিশানো দলা। বিচ্ছিরি দেখতে লাগে। পেটে মোচড় দিয়ে বমি আসতে চায়। ওয়াক্ 'থু'।

গাঙ্গুলী বাবু'র আবার সব কিছুতেই যেন বেশি বেশি। অফিসে ঢুকেই প্রথমে এক দফা গালা-গালি। নাকি সিঁটকে ভেঙ্গচি কাটবে। হাত নাচাবে ওপরে তুলে যেন কেরিক্যাচার দেখাচ্ছে। তারপরেই ওসমানের ডাক। চেয়ার টেবিল দেখিয়ে বলবে—এসব কি ওসমান? কাজে মন না থাকে বিদায় হও! অন্য একটা নিডি লোক চাকরি পাক।'

গাঙ্গুলী বাবু'র মুখের দিকে তাকালে ওসমানের হাসি পেয়ে যায়। কিন্তু সামলে নিতে হয় তাকে। সে জানে এসময় কোন কথা চলবে না। কয়েক মুহূর্ত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তারপর ভিজা নেকড়া বুলিয়ে সব সাফ করতে হবে। তাই করে ওসমান। বেশি কথার লোক সে নয়। মাত্র কটা তো মাস। একটু খাটুনি বেশি হবেই তো। তা হোক। সেজন্য সে পরোয়া করে না।

তবু মেজাজটা খিঁচিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। রাগ যে কেন হয় তা সে নিজেও জানে না। ভাল করে। মাথার গোলমালটা বোধ হয় বাড়লো আবার। চাকরীটা না গেলেই নয়। শালা গ্যাড়াকল আর কি! নিজের মনেই গালাগালি পাড়ে ওসমান।

নতুন রিশেপশানিস্ট মেয়েটি পাশ কাটিয়ে যায়। ওসমানের বেইমান চোখ কাঁধে পিঠে লুটোপুটি খেতে খেতে সোজা জলের বেসিন পর্য্যন্ত গিয়ে টোকর খাবার পর থমকে দাঁড়ায়। হয়তো আর একটু এগিয়ে ইউরিন্যাল পর্য্যন্ত চলে যেত। আসলে সময় খারাপ। খারাপ সামনের দিন। চারদিক সামলে চলতে হয় তাকে।

সামনের গাছ দুটোর পাতা ঝরে গিয়েছে। কেমন নেঙটো নেঙটো দেখাছে। রোদের একটু একটু ঝাঁজ লাগছে চোখে মুখে, কপালে। বাতাসের উষ্ণ গন্ধ এখন শীতের পীঠে শেষ লাথি মেরে দাপাচ্ছে। এ সময়টাই খারাপ। রোজ অন্ততঃ দুটো চারটে করে পড়ছেই। আর ওসমানকে নিজে হাতে করে ফেলে দিয়ে আসতে হচ্ছে বাইরে ময়লা ফেলার ড্রামে।

—'শালা ঝাড়ে-বংশে নির্বংশ হবে নাকি।' আপনা থেকেই ওসমানের মুখ খানা বিকৃত হয়ে ওঠে। ধ্যাৎ নিকুচি করেছে অত-শত ভাবনার! দুদিন বাদেই তো পালাবে সব ওপারে। ওপারে মানে গোডাউনের দিকটায়। তারপর ব্যস। নাচ কোঁদ, খাও-দাও। পাখনা সাপটাও। নিশ্চিন্ত!

অবশ্য মাঝে মধ্যে ইন্সপেক্টর মশায় এসে তড়পাবে খুব। স্টোর-কিপার বাবুকে ডাকবে। খাতা পত্র দেখবে উল্‌টে পাল্‌টে। যেন চৌদ্দ পুরুষের ঠিকুজি দেখছে আরকি।

শেষটায় চোখ উল্‌টে বলবে—'করেছেন কি ভাদুড়ীবাবু! কুইণ্টলে সাড়ে সাত'শ! জানেন, সরকারী আইনে মাত্র পাঁচ'শ গ্রাম এল্যাউড?

ভাদুড়ীবাবু বুদ্ধিমান লোক। কথা বাড়ায় না মোটে এ সময়। জানে কথা বাড়ানো মানে সাত-পাঁচ মিথ্যা দিয়ে মিথ্যা ঢাকার চেষ্টা। তাতে অসুবিধা অনেক। শুধু শুধু ঝামেলা বাড়ানো। তার চেয়ে বার দুই মাথা চুলকে এক চোখ ছোট করে একটু বিগলিত হাসি—অনেক কাজের। অনেক কথার কাজ হয় তাতে।

—'আজ্ঞে কি যে বলেন! যা গরম পড়েছে চাল শুকিয়ে হালকা হয় কত।' 'হাম্।' ইন্সপেক্টর বাবু মাথা নাড়েন। উপরে নীচে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুলিয়ে নেন বার দুই!

—'আপনার গোডাউনে দেখছি চড়ুই হয়েছে প্রচুর। এগুলো তাড়াচ্ছেন না কেন?'

—'আজ্ঞে তাড়ালে যায় কই।'

ইন্সপেকটর বাবু'র কপালে চিন্তার ছাপ। চোখে ভাবান্তর। সঙ্গে সঙ্গে পড়লো কি যেন মাথায়। হাত বুলিয়ে নেন একবার ঠোঁট বাঁকিয়ে।

ওয়াক্ থু। ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়। গা বমি বমি লাগে। সাদা-কালো দলা পাকিয়ে হাতের চেটো চট্ চট্ করছে। বিষ্ঠা।

—'দি আইডিয়া! একটা হেড আপনাকে বাড়তে হবে মিঃ ভাদুড়ী। স্প্যারো—মানে চড়ুই, আর তাতেই টু এণ্ড হাফ পারসেণ্ট কভার করতে হবে।'—ইনসপেক্টর বাবু'র :মাথা যেন হঠাৎ খুলে গেল। চোখ মুখ উজ্জল হয়ে ওঠে সঙ্গে ভাদুড়ী মশাই'রও।

তারপর মোগলাই-মাংস, কফি আসবে। ঘণ্টা খানেক চলবে খোস গল্প—মসকরা। এসব ওসমান অনেক দেখেছে।

গাঙ্গুলীবাবু'র টেবিল সাফ করে ফেরার পথে ডাক পড়লো বড় সাহেবের ঘরে। ওসমানকে এবার পড়ি কি মরি করে ছুটতে হয়।

ঘরে ঢুকেই একটু থতমত খাওয়া। নতুন রিসেপশানিষ্ট আগেই এ ঘরে এসে কখন থেকে যে বসে আছে তা ওসমান জানেই না।

—"ওসমান এসব কি চলছে অফিসে। দেখতো ভদ্রমহিলার দামী শাড়ীখানার কি অবস্থা হয়েছে।"—বলেই সাহেব বেমকা শাড়ীর আঁচল ধরে এমন টান দিলেন যেন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হচ্ছে। আর সাথে সাথে বেচারীর বুকের দুই বে-আব্রু সু-উচ্চ শিখর মৃদু দুলে উঠে ওসমানের সারা দেহে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল।

"—আহা আপনি ওকে শুধু শুধু বকছেন। ওর তো কোন হাত নেই।" —ভদ্রমহিলার গলায় সলজ্জ আকুতি।

"—আলবৎ আছে। আমরা ওকে একটা পাখি শিকার করার বন্দুকও কিনে দিয়েছি।"

ওসমানের বলতে ইচ্ছা করছিল দু'দিন বাদেতো শাড়ীই থাকবে না এ ঘরে ঢুকলে। তবে আর শাড়ীর জন্য এত মায়া কেন! রলো।

বস্তুতঃ কথাটা মনে মনে ভাবা যত সহজ বলা তত সহজ নয়। তা সে নিজেও জানে। তবু মনটা তার মাঝে মধ্যে কেমন যেন বিদ্রোহ করতে চায়। ইচ্ছা করে সব ভেঙ্গে চুরে একটা কাণ্ড ঘটাতে। কিন্তু তারপর? তারপর কি ওসমান জানেনা। ভাবতে পারে না। এসব ভাবতে সে চায়ও না। বেশি চিন্তা করলে মাথা টন্ টন্ করে। শরীর অবশ হয়ে আসে।

চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। এমনিতেই আজকাল শোবার আগে রাত্রে তাকে ঘুমের ওষুধ খেতে হয়।

বড় সাহেবের ঘর থেকে এক রকম হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে আসে ওসমান। আবার ডাক পড়লো। ছুটে যেতে হয় তাকে সারি সারি চেয়ার টেবিলের পাশ কাটিয়ে। একেবারে কোণার দিকে চক্রধরবাবু ডাকছেন। আর একটা পড়লো বোধহয়।

হ্যাঁ! যা ভাবা গেছে ঠিক তাই। নরম তুলতুলে দেহটা একটু নড়া-চড়া করলো তারপরেই একেবারে ঠাণ্ডা, নিথর। হাতের চেটোয় তুলে নিয়ে একবার ভাল করে দেখে ওসমান। তারপর মাথার ওপর ঘূর্ণ্যমান পাখার দিকে তাকিয়ে মুখখানা তার কঠিন হয়ে ওঠে, দাঁতে দাঁত ঘসার শব্দ। একটা গালা-গালি বেরিয়ে আসে অস্ফুটে তার মুখ থেকে—'শালা রাক্ষস।'

এসব নিত্য-নৈমিত্তিক, রোজকার ব্যাপার। যেমন চলে আসছে এতদিন।

কিন্তু আজ কি হলো! অফিসে ঢুকেই তার মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো। একটু আগে বেশি পয়সা খরচ করে খাওয়া চা যেন তার গলার কাছে ঠেলে উঠছে। ঢোক গিলতে গিয়ে একটা টক টক স্বাদ লাগলো জিভে। সে একবার মুখ ভেঙচালো। দু-হাতে মাথাটা চেপে ধরে ভাল করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল। না, সে ভুল দেখছে না। সারা মেঝেতে চড়ুই'র ছড়াছড়ি। ঝাড়ে বংশে মরে সব নির্বংশ হলো বোধহয় আজ। কিন্তু কি করে এমন হলো! ওপরের দিকে তাকিয়ে সে থ বনে গেল। পাখাগুলো সব চলছে। সারা রাত তাহলে পাখাগুলি চলেছে। একবার মনে করে দেখতে চেষ্টা করলো বিকালে যাবার সময় সে সুইচ অফ করেছিল কিনা। হ্যাঁ। বেশ মনে আছে, পাখা তো সে নিজে হাতে বন্ধ করেছিল। তা হলে? কে চালালো পাখাগুলি। কে চালালো? কেমন করে এ সম্ভব হলো! সে কিন্তু কিছুই ভেবে পেল না। মনে হবে কোথায় যেন একটা দারুণ গোলমাল হয়ে গেছে। একটা ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে আছে তার চারদিকে। আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে ফেলতে চাইছে তাকে। চিন্তার সূত্রগুলি কেমন জট পাকিয়ে তার সমস্ত অনুভূতিকে অসাড় করে দিচ্ছে। মাথাটা টন টন করছে। পেটে মোচড় দিয়ে উঠলো। চোখের কোণ ভিজে উঠেছে। চিক্

চিক্ করছে। ক্ষোভে ও বেদনায় তার কাঁদতে ইচ্ছা করলো। আসলে সে কিন্তু কাঁদলো না।

বুকে হাত রেখে সে যেন কিছু বুঝতে চেষ্টা করলো। সামান্য অনুভূতি। একটু স্পর্শ তার হৃদয়ের। এমনি করেই নিজ আত্মাকে সাক্ষী রেখে সে ওপরের দিকে তাকালো। পাখাগুলি ভোঁ ভোঁ শব্দে ঘুরেই চলেছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে উচ্চারণ করলো—'বেইমান।'

অফিস ঘরে পায়চারি করলো কিছু সময় ওসমান। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে। সারা মেঝেতে কত যে চড়ুই পড়ে আছে যেন গুণে শেষ করা যাবে না। ছোট ছোট কতগুলি পালক বাতাসে উড়ছে। তার গায়ে মুখে পড়ছে দু-একখানা। একটা ভ্যাপসা গন্ধ। বস্তুত সে দিকে তার কোন লক্ষ্য নেই।

অফিস ঘরের মাঝা-মাঝি এসে হঠাৎ থামল ওসমান। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর কাজে হাত লাগালো। দ্রুত সাফ করতে হবে সব। হাতে সময় বেশি নেই। কাজেই ঝাঁটা ঝুড়ি নিয়ে এলো এবং দ্রুত ঝুড়ি ভরে বাইরে ময়লা ফেলার ড্রামে ফেলতে লাগলো। ফিনাইল-জল দিয়ে সারা মেঝে ধুয়ে দিল ভাল করে। তারপর শুকনো পাট দিয়ে মেঝে ঘসতে ঘসতে সে কপালের ঘাম মুছলো।

দশটায় অফিস আরম্ভ হলে আজ আর ওসমানের ডাক পড়লো না। কাজেই এক কোণে তার নির্দিষ্ট টুলে বসে সে ঝিমতে লাগলো। কতক্ষণ এমনি ভাবে কেটেছিল বলা শক্ত। তারপর একসময় হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো সে। শিরদাঁড়া টান টান করে হাত দুটো ওপরে তুলে সমস্ত শরীরে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনী দিল ওসমান। শরীরটা বেশ হাল্কা মনে হচ্ছে এখন। ধীর পায়ে চলতে সুরু করলো এবং একটু দূরে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় এসে থামলো। ডান দিকে চোখ ঘুরিয়ে জালের ঢাকনা দেওয়া বাক্সবন্দী বিরাটকায় যন্ত্র দেখতে পেল। তার মাথাটা আবার টন্ টন্ করে উঠলো। সরে আসবে বলে বাঁ দিকে ঘুরতেই তার চোখ দুটো জল জল করে উঠলো। নতুন তৈরী কাঠের পার্টিশান এবং কিছু কাঠের টুকরো ছড়ানো ছিল সেখানে। তারই একপাশে নানা রকম যন্ত্রপাতির মধ্যে সে টাঙিখানা দেখতে পেয়েছিল।

চারদিকে একবার সে চোখ বুলিয়ে নিল। না, কাছেপিঠে কেউ নেই। টুপ করে টাঙিখানা হাতে তুলে নিয়ে সোজা এগিয়ে চললো তারের ঢাকনা দেওয়া বাক্সটার দিকে। একটু অন্ধকার মত জায়গাটা। কিন্তু তার চোখ তখন জ্বলছিল দপ্‌ দপ্‌ করে। সে আগুনের উত্তাপে অন্ধকার সরে সরে যাচ্ছিল এবং লক্ষ্য স্থির করতে তার মোটেই কষ্ট হলোনা।

এবং বলিষ্ঠ দুই হাতে টাঙিখানা চেপে ধরে মুহূর্ত মধ্যে সজোরে কোপ বসালো।

অক্কুর

জ্যোৎস্নাময় বসু

৺কালীপূজার মণ্ডপে আমি যেতে পারি না। বহু বছর থেকে যেতে পারিনা। অথচ ছোটবেলায় এই পূজা নিয়ে কত মেতে থাকতাম। একসময় মাতামাতি কমে গেলেও ৺কালীপূজা আমার কাছে ছিল একটা বিশেষ উৎসব। সারাবছর ওই পূজার প্রতীক্ষায় থাকতাম। কিন্তু আজকাল ৺কালীপূজা-উৎসব আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন, একটা বিভীষিকা।

৺কালীপূজায় ঢাকের বাদ্য শুনলে আমার চোখের সামনে সেই দৃশ্য ফুটে ওঠে। সেজন্য কালীপূজার মণ্ডপে আমি আর যাইনা। কিন্তু পূজা দেখা এড়াতেও পারি না। আজকাল কালীপূজা বারোয়ারী হয়েছে। কোন্ পূজাই বা হয়নি ? শনিপূজা বারোয়ারী হতে বোধ হয় আর দেরী নেই।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন পূজা বলতে ছিল ৺দুর্গাপূজা। ৺দুর্গাপূজাই তখন একমাত্র বারোয়ারী ছিল। ৺সরস্বতীপূজা ছিল ছাত্রদের ব্যাপার; কাজেই অনেক পাড়ায় ৺সরস্বতীপূজা হলেও ঠিক তাকে বারোয়ারী আখ্যা দেওয়া যেত না—ছাত্ররা নিজেরা সে পূজার সব ব্যবস্থা করত।

আজকাল বারোয়ারী পূজার সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ৺কালীপূজাও বারোয়ারী হয়েছে। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাতায়াতের পথে পূজা মণ্ডপ দেখা হয়ে যায়। একেবারে ঘরে বসে তো থাকা যায় না।

সব মণ্ডপেই মাইক চলে আজকাল। আমাদের ছোটবেলায় ঢাক বাজত। আজকালও কোন কোন মণ্ডপে মাইকের সঙ্গে ঢাকও থাকে। ওই ঢাক দেখলেই অক্কুরদার কথা মনে পড়ে যায়।

অক্কুরদার কথা মনে হলে আমি আর কিছু দেখতে পাই না। সব কিছু চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে যায়। এজন্য বার কয়েক আমাকে লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয়েছে। নেহাত আমার জামা কাপড় মোটামুটি ধোপদুরস্ত থাকে বলে চড়চাপড় কোনদিন খেতে হয়নি; কিন্তু কটূক্তি, বক্রোক্তি ইত্যাদি অনেক সময়ই শুনতে হয়েছে।

অক্কুর কে? সত্যিই তো অক্কুর আমার কে? কেন ৺কালীপূজার মণ্ডপে

ঢাক দেখলেই আমার ও রকম হয় ? নামটাও হয়ত অকুর না, হয়ত অক্রুর হবে। তাও হলফ্ করে বলতে পারব না। নামের সঙ্গে যে একটা পদবী থাকতে হয় সে কথা অক্রুরদার বেলায় আমার কখনও মনে হয়নি।

অক্রুরদা আমার কেউ নয়। তার সঙ্গে আত্মীয়তা থাকার প্রশ্ন ওঠে না। আত্মিক যোগও আছে বলে মনে হয় না। আমি জন্মসূত্রে একজন ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক এবং সে গর্বে আমি অনেকটা স্ফীত। আমার সঙ্গে নিচু জাতের অশিক্ষিত অক্রুরদার কোন সম্পর্ক থাকতে নেই। ৺কালীপূজার মণ্ডপে ঢাক দেখলে আমার চোখ ঝাপসা হবার কোন মানে হয় না। একথা আমি বুঝিও কিন্তু তবু প্রতিবারই আমার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। এজন্য ৺কালীপূজা আমি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলি।

৺কালীপূজার দিনকয়েক আগে আমরা যেতাম আমাদের গ্রামে—'বৌসমশয়ের' বাড়ী। এই বৌসমশয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাতি। আমি অবশ্য তাকে কখনও বৌসমশয় বলে ডাকিনি। গ্রামের লোকেরা সবাই তাকে ওই নামেই ডাকত।

বৌসমশয় ছিলেন রাশভারী মানুষ। আমাদের তিনি খুব স্নেহ করতেন, গেলে যত্ন আত্তি করতেন এমন কি আমাদের নিয়ে থিয়েটারও করতেন। কিন্তু তবুও আমরা সর্বদাই তার ভয়ে তটস্থ থাকতাম। মহিষাসুর বা পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং হিসাবে তাকে মানায়ও ভাল।

গ্রামে তার যথেষ্ট জমি-জমা ছিল, এই জমির উৎপাদনের ভাগ থেকে মোটামুটি সংসার চলে যেত। বাড়তি টাকা প্রায় সবটাই খরচ করতেন ওই ৺কালীপূজা উপলক্ষে। বাড়ীতে ঘটা করে পূজা করতেন তিনি। খরচ করতে এবং অনেক লোকজন নিয়ে উৎসব করতে তিনি ভালবাসতেন। পূজার দিন নিরম্বু উপবাস করে রাতে পূজার মণ্ডবী হতেন।

এই বৌসমশয় রসিক ছিলেন বলে শুনেছি। আমাদের সঙ্গে বা আমাদের সামনে অবশ্য কোনদিন রসিকতা করতেন না।

শুধু একদিন তার রসিকতার কিছু আঁচ পেয়েছিলাম আমি—সেবার তার বড়মেয়ের বিয়ের কিছুদিন পর।

বড় মেয়ের বিয়েও দিয়েছিলেন খুব ধুমধাম করে, বলতে গেলে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে। উৎসব হলে তিনি সাধ্যমত খরচ করতেন। ৺কালীপূজায় তো প্রায়

সাধ্যের বাইরে খরচ করতেন। তার বড়মেয়ের বিয়েতে যে বাড়াবাড়ি করবেন তাতে আর বিচিত্র কি? আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিমন্ত্রণ তো করেইছিলেন, উপরন্তু গ্রামশুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান, উঁচুজাত-নিচুজাত নির্বিশেষে সবাইকেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

তার এইরূপ ব্যবহারের জন্যই বোধ হয় তিনি বৌসমশয়, বোসমশয় বা অমুক বোস নন।

মেয়ের বিয়ে চুকে যাবার কিছুদিন পর দেখা গেল যে তিনি রোজই ফিনফিনে ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবী পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একদিন আমার এক মামা জিজ্ঞেস করলেন—বৌসমশয়, মেয়ের বিয়ে দিয়ে শুনেছি লোকে ছেঁড়া জামা কাপড় পরে, আপনি সিল্কের পাঞ্জাবী পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—ব্যাপার কি?

—বুঝতে পারলে না তো? আমি এখন নিঃস্ব হয়েছি। লোকের কাছে হাত পাতলে এই সিল্কের পাঞ্জাবী দেখে দশটা টাকা অন্তত দিয়ে দেবে। ছেঁড়া জামাকাপড় দেখলে হয়ত বাড়ীতে ঢুকতেই দেবে না। এখনই তো এই সৌখীন পোষাকের দরকার।

আমি কিন্তু জানতাম এটা সত্যিই রসিকতা, আসল কথা নয়। বৌসমশয় তখন এত সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন যে সাধারণ জামাকাপড় কেনবার পয়সা ছিল না। সাধারণ জামাকাপড় ছিঁড়ে যেতে তোলা থাকা এই সব সৌখীন জামাকাপড় পরতেন। কারো কাছে হাত পাতবার লোক তিনি ছিলেন না।

এই বৌসমশয়ের বাড়ীতে আমি অক্রূরদাকে দেখি।

৺কালীপূজায় তার বাড়ীতে না গেলে বৌসমশয় রাগ করতেন। কি বছর সবার যাওয়া সম্ভব হত না কিন্তু আমি যেতাম প্রতিবারই। ওই পূজা থেকেও আমার বেশী আকর্ষণ ছিল অক্রূরদা।

অক্রূরদা পূজোতে ঢাক বাজাতেন—সঙ্গে তার ছেলে কাঁসী বাজাত। আমি প্রায় সব সময় অক্রূরদার কাছে বসে থাকতাম। তার ঢাকের বাজনার বোল আমার কানে অক্রূরদার নামের সঙ্গে একাকার হয়ে যেত।

অক্রূরাকুর—অক্রূরাকুর—অক্রূরাকুর কুরাঃ,
কুরকুরকুরকুর কুরকুরকুর কুরকুর কুরকুর কুরা,
কুরকুর কুরাকুর কুরাকুর রাকুরাকুর
রাকুরাকুর রাকুরাকুর রাকুরাকুর কুরাঃ।
অক্রূরাকুর—অক্রূরাকুর ইত্যাদি।

আমার কানে সেই ঢাকের বাদ্য এই ভাবেই বাজত। মনে মনে আমি এভাবেই ওই বাদ্যের বোল আওড়াতাম।

অক্রূরদার কাছে নিজেকে বড় ছোট মনে হত। মনে হত তিনি কত গুণী। একটা ঢাক থেকে তালের সঙ্গে বোলের কি মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। মনে হত ওই ঢাক দিয়ে যা খুশী তাই করাতে পারেন—ঢাক যেন তার কত বাধ্য। আমার মনে হতো এ থেকে কঠিন কাজ পৃথিবীতে আর হয় না।

একসময় অক্রূরদা পিঠে ঢাক ঝুলিয়ে বাজনার সঙ্গে নাচতেনও। সে নাচও ছিল মনমাতানো। দুহাতে কাঠি নিয়ে ঢাকের পিঠে পেটাবার সময় মাথা ঝাঁকিয়ে সুললিত ভঙ্গীতে পায়ে তাল মিলিয়ে সারা উঠানময় ঘুরে ঘুরে নাচতেন। ছেলে কাঁসী বাজাতে বাজাতে পা ঠুকে ঠুকে নাচের ভঙ্গীতে তাল ঠুকত।

সেসময় অক্রূরদাকে দেখে মনে হত চারপাশের দিকে তার হুঁস নেই। ওই ঢাক আর নাচ ছাড়া আর সব কিছু তার কাছে লোপ পেয়েছে। যেন একজন দেবদূত অক্রূরদার মধ্যে প্রবেশ করেছে!

অক্রূরদার সঙ্গে আমারও নাচতে ইচ্ছা করত। মনে মনে অক্রূরাকুর অক্রূরাকুর বোল আউড়ে নাচতামও কিন্তু আসরে নামতে সাহস হতো না। তাছাড়া বৌসমশয়ের ভয় তো ছিলই।

পাঁঠা বলির সময় অক্রূরদা উদ্দাম হয়ে যেতেন। অক্রূরদা নেচে নেচে এক ঢাকেই চার ঢাকের আওয়াজ তুলে দ্রুতলয়ে বোল বাজিয়ে বলির পাঁঠার সব চিৎকার ডুবিয়ে দিতেন।

সে ঢাকের বাদ্য যেমন ছিল প্রাণবন্ত তেমনি ছিল মধুর। উপস্থিত সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন। আজ আর কোন ঢাকের বাজনা আমার পছন্দ হয় না। অনেক বারোয়ারী পূজায় চার ঢাকের বাদ্যও শুনেছি কিন্তু কি তার আওয়াজ, কি তার মধুরতা, কি তার তাল বোলের সমন্বয় কোন কিছুই সেই অক্রূরদার কাছে পিঠেও ঘেঁষতে পারে না।

সুযোগ পেলেই আমাকে শিখিয়ে দেবার জন্য অক্রূরদার কাছে আবদার করতাম। অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি রাজী হন নি। তিনি বলতেন:

—তুই লেখাপড়া শিখা দারোগা অবি। নাইলে গিয়া জজ মেজিষ্টর অবি। এই বাদ্যি শিখা তর কি অইব?

একথা বলে তিনি আমাকে আমলই দিতেন না। অক্রুরদার ওই এক কথা, আমি লেখাপড়া শিখে দারোগা হব। নিদেনপক্ষে 'জজ মেজিষ্টর' তো হবই। অক্রুরদার কাছে দারোগার চাকরী ছিল সবচেয়ে বড় চাকরী। তার ধারণা ছিল যে, সহরে মেজিষ্ট্রেটরা দারোগার নিচে চাকরী করে।

আমি আমার মত করে জজ মেজিষ্ট্রেট আর দারোগার তফাত বোঝাতে চেষ্টা করতাম। তিনি শুনে রেগে যেতেন।

—হুঃ, আমি বুড়া অইয়া গেলাম, আমারে আর তর শিখাইতে অইব না। দারোগার উপরে তো আইজ পর্যন্ত কাউরে দেখলাম না।

তর্ক করলে আরও রেগে যেতেন:

—আর কথা কইস না। দারোগা আইয়া যহন বাইন্দা লইয়া যাইব তহন টের পাবি। সঙ্গে আমারেও লইয়া যাইব। আর কথা বাড়াইয়া কাম নাই।

অক্রুরদার উপর এজন্য মাঝে মাঝে আমার রাগ হত। কিছুতেই আমাকে বাজনা শেখাতে রাজী হননি।

অক্রুরদা কখনও এদিক ওদিক গেলে আমি সেই ঢাকে দু'একবার আমার বিদ্যা জাহির করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সে আওয়াজ এমনই কর্কশ লেগেছে যে তখনই ছেড়ে দিয়েছি। বুঝেছিলাম যে অক্রুরদা না শেখালে সে বাদ্য আয়ত্ব করা আমার সাধ্য নয়।

পাঁঠাবলির পর আর কোন আকর্ষণ থাকত না বলে তখন শুতে চলে যেতাম। সকাল বেলা উঠে পূজার প্রসাদ খেয়ে পুবের ভিটার পিছনে ছুটতাম। সেখানে তখন অক্রুরদা পিঠে রোদ নিয়ে পাঁঠার ছাল ছাড়াতেন। ছাল আর নাড়িভুড়ি তার প্রাপ্য ছিল। নাড়িভুড়ি দিয়ে কি করতেন জানিনা—বোধ হয় ফেলে দিতেন। ছালটা শুনেছি শুকিয়ে বিক্রী করে দিতেন।

একটা গাছের ডালে সামনের পায়ে মুণ্ডহীন পাঁঠাটাকে ঝুলিয়ে নিপুণভাবে তিনি ছাল ছাড়িয়ে ফেলতেন। এই ছাল ছাড়াবারও অনেক টেকনিক আছে। যেখানে সেখানে চামড়া কেটে গেলে তার আর এক কানাকড়িও মূল্য থাকবে না। কতকগুলি বিশেষ লাইনে চামড়া চিঁড়তে হত। তারপর টেনে টেনে ছাল ছাড়াতেন। কোথাও বেজে গেলে ছুরি দিয়ে আলতোভাবে ছাড়িয়ে নিতেন।

আমি সারাক্ষণ বসে বসে অক্রুরদার সঙ্গে গল্প করতাম। তিনি মাঝে মাঝে

আমাদের সহরের গল্প শুনতেন। গল্প করতে তিনি খুব ভালবাসতেন, আবার কাজে ভুল হবার উপক্রম হলে আমার উপর রেগে যেতেন।

—পোলাভা কথাই কয় আর কথাই কয়। কথায় পাইলে আর হুঁস থাকে না। যা তো তুই, বাড়ীর ভিতরে যা।

আমাকে বকে কাজে মন দিতেন। একটু পরেই রায়দের বাড়ীতে বিয়ের সময় যে ইংরেজী বাদ্য এসেছিল সে গল্প শুরু করতেন।

—টাহা থাকলে ওই রহম বাজনা হক্কলেই বাজাইতে পারে। কতগুলা লোক লাগে। আর পোষাকেরই বা কত বাহার। কত নমুনাই দেখলাম।

বলে মুখ ঝামটা দিয়ে চুপ করে যেতেন। একটু পরে বলতেন:

—হুনতে কিন্তু বালই লাগে। আমাগো বাত মারব হালারা।

অক্রূরদার সঙ্গে আমার একটুকুই পরিচয়। অক্রূরদাকে আমি ঢাক বাজাতে আর পাঁঠার ছাল ছাড়াতে দেখেছি। এই দুই দৃশ্য আমার মনে তখন গেঁথে গেছে। কোন প্রসঙ্গে অক্রূরদার কথা উঠলে আমার চোখের সামনে এ দুটি দৃশ্যই তখনই ভেসে উঠত। আজকাল অনেক চেষ্টা করেও অক্রূরদার ওই দুই রূপ আমি আর মনে আনতে পারি না।

ওই দুই রূপ ছাড়া তাকে আর দেখার কথা মনেও হয় নি। আমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? তার যে সংসার আছে, তাকেও যে সংগ্রাম করে জীবন ধারণ করতে হয় সে কথা তখন আমার মনে হয় নি। ওই দুই রূপ ছাড়া অক্রূরদাকে আমি যে আর দেখিনি তখন পর্যন্ত।

দেখেছিলাম শুধু আর একবার। মুহূর্তের জন্য। অন্য দুই রূপ দেখেছিলাম। সে দেখা···

আমি তখন কলেজে পড়ি। অনেক ছেলেমানুষী তখন আমি বর্জন করেছি। বোসমশায়ের বাড়ী আর প্রতি বছর যাই না। গেলেও অক্রূরদার কাছে আর সারাক্ষণ বসে থাকি না। ঢাকের বাজনা শেখবার শখ আর নেই। অক্রূরদাকে নাচতে দেখে আর নাচতে ইচ্ছা করে না।

অক্রূরদা কথায় কথায় আমাকে আর ধমকান না। সমীহ করে কথা বলেন। একটা পাশ দিয়ে আমি তখন অক্রূরদার কাছে আপনি হয়ে গেছি। ঢাকের বাজের সঙ্গে অক্রূরাকুর বোল আর তত স্পষ্ট নয় আমার কাছে।

৺কালীপূজায় বোসমশয়ের বাড়ী গেলে অকূরদার কাছে একবার অবশ্য যাই। জিজ্ঞেস করি :

—অকূরদা, কেমন আছ?

—আপনে গো আশীর্বাদে আইগ্যা বালই আছি। আপনে কেমন আছেন? আমাদের এই পর্যন্তই কথা হয়। কথা আর এগোয় না। রায়দের বাড়ীর গল্প বা ঘোষালদের ৺মনসা পূজার কথা নিয়ে আমার আর সময় নষ্ট হয় না। অকূরদাও কথায় কথায় রেগে উঠবার সুযোগ পান না। আমি কলেজে নতুন নতুন কত কি নিয়ে মেতে থাকি তখন। ওসব তুচ্ছ কথা শুনবার আমার সময় কোথায়?

যুদ্ধ তখন আমাদের দোর গোড়ায় এসে ঢুকেছে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনও শেষ। নেতাজীর রেডিও ঘোষণাও প্রায় পুরানো হয়ে গেছে। তখন শোনা যাচ্ছে চালের দাম বাড়বে। একটা আতঙ্ক নিয়ে আমরা দিন কাটাচ্ছিলাম।

আমার সোনাকাকা ব্যবসা করতেন। তিনি একদিন রাতে দোকান থেকে ফিরে বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তখনও আমরা শুতে যাইনি। সোনা-কাকা ভনিতার ধার ধারেন না।

—চিনিবাই, কিছু চাউল কিনা রাখেন। চাউলের দাম কিন্তু বাড়ব।

—বাড়লে বাড়ব।

—আউজগা শুইনা আইলাম চাউলের দাম দশটাকা পর্যন্ত অইতে পারে।

—তর মাথা খারাপ অইছে। এ কি মগের মুলুক নাকি? দশটাকা! দশ টাকা অইলে হগগলে না খাইয়া মরব না?

—আপনে রাগ করতাছেন কিন্তু চাউল কিনা রাখলে বালা করতেন।

—হঃ। তর যেমন কথা। দশটাকা! গবর্মেন্ট আমাগো না খাওয়াইয়া রাখব নাকি?

বাবা চটে গেলেন সোনাকাকার কথা শুনে। আরও কিছুক্ষণ গজগজ করে সোনাকাকাকে বিদায় দিলেন।

—তুই অখন খাইটাপিটা আইছস—খাইয়া দাইয়া শুইয়া পর গিয়া। দশ-টাকা! কইলেই অইল? চাইর দিকে আগুন লাগব না? আমি যেমুন মাসের বাজার করি ওই রকম করুম। দেখুম, গবর্মেন্ট আমাগো কি কইরা না খাওয়াইয়া রাখে।

এ ঘটনার মাত্র দিন কয়েক পরে একদিন সকালে বাবা বাজার থেকে ফিরে কোন কথা না বলে নিজেই কল্কে তৈরী করে হুঁকা টানতে লাগলেন। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মার কাছে বাজারের ফিরিস্তি দিলেন না। দত্তমশায় যে বাজারে তার কাছে হেরে গেছেন সেকথাও সবিস্তারে বর্ণনা করলেন না। বাজারের ভুলা ও থলি নামিয়ে রেখে তামাক সাজাবার জন্ম কাউকে হুকুম পর্য্যন্ত করলেন না।

একটুক্ষণ পর হুঁকা নামিয়ে রেখে মাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ভিতরে। তার পরই বেরিয়ে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাড়ী থেকে।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম ক্ষেত্র সাহার দোকানে। সে দোকান থেকে আমাদের মাসকাবারী বাজার হত। দোকানে গিয়ে বাবা চার মণ চাল পাঠিয়ে দিতে বললেন। ক্ষেত্র সাহা জানালেন যে চালের দাম তখন বার টাকা। শুনে বাবা রেগে গেলেন।

—বাজারে যাওনের সময় কইলা আট টাকা। তুই ঘণ্টাও পার অয় নাই, এরই মধ্যে বার টাকা? মগের মুল্লুক নাকি? তোমাগো কি ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাম বাড়ে নাকি? পাঠাইয়া দাও চাইর মণ, ওই আট টাকাই দর পাইবা।

ক্ষেত্র সাহা সেদিন প্রথম বাবার মুখের উপর না বলে দিলেন।

বাবা রেগে ক্ষেত্র সাহার দোকান ছেড়ে চললেন বাজারের দিকে। নিজের মনে গজ গজ করতে করতে চললেন। সেখানে গিয়ে শুনলাম চালের দাম ষোল টাকা।

বাজারের এসব দোকানদার বাবাকে তোয়াক্কা করে না, কাজেই বাবা বেশী কিছু বলতে পারলেন না। আরও দোকানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সেখানে আরও দাম বেশী। আবার ফিরে এলাম প্রথম দোকানে সেখানে তখন দর বাইশ টাকায় উঠে গেছে। আবার কয়েকটা দোকান দেখে দিশাহারা হবার উপক্রম। এদিকে ভীড়ও বেড়ে যাচ্ছে—চালের বেচাকেনার হিড়িক লেগে গেছে। ছুটতে ছুটতে চলে এলাম আবার ক্ষেত্র সাহার দোকানে।

ক্ষেত্র সাহার দোকানে তখন দর পঁয়ত্রিশ টাকা, আবার বাবা রেগে গেলেন। ক্ষেত্র সাহাকে কষে গালাগাল দিয়ে ছুটলেন বাজারে। বাজারে তখন চালের দর নেই কারণ বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে গেছে। চাল থাকলে তো দাম। আবার ক্ষেত্র সাহার দোকানে। সেখানে একই অবস্থা। চাল নেই।

বাবা তখন অনেক নরম হয়ে গেছেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার

কান্না পেয়ে গিয়েছিল। বাবা অনেক অনুনয় বিনয় করলেন ক্ষেত্র সাহার কাছে। দামের কথা তুললেন না। যে দামেই হোক অন্তত এক মণ চাল যেন ক্ষেত্র তাকে দিয়ে দেয়।

ক্ষেত্র সাহার এক কথা। সময় থাকতে বাবা চাল নিলেন না। উনি কি করতে পারেন ?

বাবা কিছুক্ষণ ক্ষেত্র সাহার দোকানে বসে রইলেন। হঠাৎ উঠে হাঁটতে শুরু করলেন। বাজার ছাড়িয়ে আরও কিছুটা গিয়ে রমেশ বসাকের মণিহারী দোকানে উঠলেন।

রমেশ বসাক তখন একাই বসেছিলেন দোকানে। তিনি এককালে বাবার ছাত্র ছিলেন। আমি তাকে চিনি। বাবার হাতে তার অনেক লাঞ্ছনার কথা আমি জানি। প্রায়ই বাবা বলতেন যে ওর দ্বারা লেখাপড়া কিছু হবে না। সে যেন একটা দোকান দিয়ে বসে।

রমেশ বসাক শেষ পর্যন্ত তাই করেছেন। কিন্তু বাবার প্রতি একটা অহেতুক শ্রদ্ধা রয়েই গেছে। সেই জোরেই বাবা বিপদের সময় তার কাছে এসেছেন।

রমেশ সব কথা শুনে দোকানে আমাদের বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। জানিয়ে গেলেন যে চালের দাম বোধ হয় ষাট টাকা পড়বে।

বাবা তখন তাতেই রাজী। তাছাড়া উপায়ই বা কি ?

সেখানে বসে বসে আমার মনে পড়ল আর একদিনের কথা। সেদিনও বাবার সঙ্গে বাজারে এসেছিলাম। পথে ক্ষেত্র সাহার দোকানে চালের দর জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন যে দর সেদিন ছ আনা। বাবা বললেন—

—কেন ? দর তো পাঁচ আনা, ছআনা চাও কেন ? ক্ষেত্র সাহা বললেন চাউলের বাজার বড় চড়া।

বাবা : ওসব আমি শুনুম না। পাঁচ আনায় দিবা তো দাও, নইলে আমি আমি অন্য দোকানে যামু।

ক্ষেত্র : এত জুলুম করলে আমরা বাঁচি কি কইরা ?

এই পাঁচ আনা ছ' আনার ব্যাপার আমি পরে জেনেছিলাম। মণ প্রতি চারটাকা পাঁচ আনা। চারটাকা বলার দরকার হত না। দর ওঠা নামা ওই আনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। মণ প্রতি বাড়তি একআনাও সেদিন দিতে রাজী

ছিলেন না বাবা। আজ তিনি একমণ চাল ষাট টাকা দিয়েও কিনতে রাজী। গবর্ণমেন্টের উপর সমস্ত ভরসা তখন তার ধুলিসাৎ হয়ে গেছে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে রমেশ ফিরে এসে জানালেন যে চালের জোগাড় হয়েছে এবং পঁয়ত্রিশ টাকাতেই পাওয়া গেছে।

তারপরই শুরু হল ছুর্ভিক্ষ, একটু ফ্যানের জন্ত হাহাকার, রাস্তায় অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। কলেজে যেতে যেতে রাস্তায় মৃতদেহ, অর্ধমৃত দেহ দেখতে দেখতে গা-সহা হয়ে গেছে। বাড়ীতে বেশী আলুর কুচির সঙ্গে কম চাল মিলিয়ে 'ভাত' রান্না হচ্ছিল। আমরা খেতে পাইনি এ অবস্থা হয়নি। বাবার ওজন পৌনে তিন মণ থেকে পৌনে দুই মণে দাঁড়িয়েছিল এই মাত্র। বাবার ভবিষ্যৎ বাণীও সফল হয়নি—কোথাও আগুন জ্বলে নি।

আমার লেখাপড়া লাটে উঠেছে। পাড়ায় রিলিফ কমিটি, কলেজে রিলিফ কমিটি নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত থেকেছি। বাবা আমার লেখাপড়ার কথা একবারও তখন তোলেননি।

শুনেছি গ্রাম ছারখার হয়ে গেছে। নিজে দেখিনি, শুনেছি শুধু। ছারখার শব্দটাই তখন শুনেছি, ব্যবহার করেছি, কিন্তু ছারখারের চিত্র দেখিনি। দেখেছি শুধু 'ফ্যান দাও' দলকে, দলের পর দলকে। দেখেছি রাস্তায় পড়ে থাকা অনাহারে মৃত্যুর সাক্ষী। কিন্তু গ্রাম দেখিনি।

একদিন বোসমশয় এলেন সকাল বেলা। ঘণ্টাখানেক থেকে চলে গেলেন। বাবা মা অনেকবার বলা সত্বেও খেয়ে গেলেন না। আমাদের একজনের এক-বেলার অন্ন ধ্বংস করতে রাজী হলেন না। তিনি আমাদের খবর নিতে এসেছিলেন। তার কাছে গ্রামের কথা শুনেছি।—আমরা তো ভাল আছি—মণ্ডামিঠাই খেয়ে থাকছি। কিন্তু মুসলমান পাড়া, নমঃ শূদ্র পাড়া সাফ হয়ে গেছে। কেউ কেউ গেছে। বাকীরা সহরের দিকে হাঁটা দিয়েছে। গ্রামে আমরা কয়েক ঘর রয়ে গেছি।

পরে জেনেছি বোসমশায়ের কথা একটুও অতিরঞ্জিত না। রসগোল্লা ও মিষ্টি আলু ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। বাজারে পাওয়া যেত, দাম বাড়েনি কারণ কেনবার লোক প্রায় ছিলই না।

আমরা একটা লঙ্গরখানা খুলে ফেললাম। সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটির সাহায্যও পাওয়া গেল। রোজ লঙ্গরখানা থেকে খিচুড়ী বিতরণ করতাম।

আমাদের মত আরও অনেক লঙ্গরখানা ছিল বলে অল্প অল্প দিয়ে ভীড় অনেকটা সামলাতে পারতাম। তাও হিমসিম খেতে হতে। কিছু লোককে ফিরিয়েও দিতে হত। লাইন করে দাঁড় করান, একবারের বেশী লাইনে না দাঁড়াতে পারে, সে সবও দেখতে হত।

কিছুদিনের মধ্যে এসব কাজে আমরা পারদর্শী হয়ে উঠলাম। এসব কাজে একটা নেশাও আছে। আমাদের কাছে ওই কাজের নেশাটাই বড় হয়ে উঠছে। দুর্ভিক্ষ, গ্রাম ছারখার হয়ে যাওয়া ইত্যাদি শুধু কথা হয়ে রইল। এসব করে যে কি উপকার হচ্ছে বা কার উপকার হচ্ছে সে বিষয়ে মাথা ঘামাইনি।

এসব লঙ্গরখানা নিয়ে ব্যস্ত থেকে আমরা মজুতদারদের রেহাই দিলাম। তখন বুঝতে পারিনি সে কথা। বুঝতে পারিনি যে মানুষের সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষ আমরা রোধ করতে পারতাম। ষাট লক্ষ মানুষ বা অমানুষ অনাহারে না মরে মজুত উদ্ধার করতে গেলে পুলিশের গুলিতে এক লক্ষ লোকের বেশী মরতে হত না। যাক সে কথা। তখন সে কথা আমরা বুঝিনি, যারা মরেছে তারাও বোঝেনি।

আমাদের লঙ্গরখানা ছিল নদীর ধারে একটা মাঠে। সে মাঠের এক পাশে গোটা কয়েক চুলা জ্বালিয়ে খিচুরী রান্না হত। চাল আর ডাল মিশিয়ে সেদ্ধ করে যে বস্তু তৈরী হত তাকেই বলা হত খিচুরী। এ খিচুরী যে কত মূল্যবান সে কথা বুঝতাম।

একমুঠো ভাতের অভাবে কত লোক মরে যাচ্ছে, ফ্যান খেয়ে খেয়ে কত লোকের হাত পা ফুলে গেছে এসবের হিসাব তখন জানতাম না। শুধু ভাবতাম এদের মধ্যে এখনও যারা বেঁচে আছে তাদের যদি বাঁচিতে রাখতে পারি তাহলে একটা মস্ত কাজ করা হল।

এইসব অসহায় মানুষদের উপর তখন রাগ ত কম করিনি। একজনকে দ্বিতীয়বার লাইনে দেখলে লোভী, স্বার্থপর, চোর ইত্যাদি বলে গালাগালি দিয়েছি। দিনের পর দিন অনাহারে থাকার পর এক হাতা খিচুড়ী খেয়ে আর একহাতা পাবার জন্যে লাইনে দ্বিতীয়বার দাঁড়িয়ে কত অপরাধ যে সে করেছে সে কথা গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করেছি।

এই সব কর্মযজ্ঞের মধ্যে আমার মত সব কর্মীরা তখন যে যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি, সে কথা কেউ অস্বীকার করেনি। এমন কি আমার বাবাও আমার

প্রতি বিরূপ হননি। দেশে আগুন লাগার কথা তিনি ভুলে গেছেন। আগুন লাগাতে হলে যে আমাদের মত যুবশক্তিকে এভাবে অপচয় না করে আগুনের মুখে ঠেলে দিতে হয় সে কথা তিনি জানতেন না। যারা জানতেন তারা হয় তখন জেলে বন্দী হয়ে দায়িত্ব এড়িয়েছেন। আর বাকীদের একাংশ কুপল্যাণ্ড প্রস্তাব নিয়ে হৈ চৈ লাগিয়েছে, অন্য অংশ রিলিফের কাজকেই দেশের কাজ বলে ডাক দিয়েছেন।

আমরা সকাল থেকে লঙ্গরখানা নিয়ে ব্যস্ত। চাল ডালের পারমিট নিয়ে দরবার, তার আনার ব্যবস্থা, খিচুড়ী রান্না ও বিলি করা নিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছি।

খিচুড়ী বিলি করাই ছিল সবচেয়ে পরিশ্রমসাধ্য। যারা মাটির বা কলাই করা পাত্র নিয়ে আসত তাদের হাতায় করে আর বাকীদের পাতার ঠোঙায় খিচুড়ী বিলি করা খুবই কষ্টসাধ্য। হাত ব্যথা হয়ে যেত, তাও ভ্রূক্ষেপ করতাম না। মহৎ কাজে পরিশ্রম করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম। লাইনের লোকদের প্রতি গালাগালি চেচামেচি তো লেগেই ছিল।

এই রকম পরিশ্রমসাধ্য কাজের মধ্যে একবার আমার হাত কেঁপে উঠেছিল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

একটা মাটির পাত্র সামনে বাড়িয়ে ধরতে হাতা থেকে খিচুড়ী ঢালাতে গিয়ে চোখাচোখি হয়ে গেল। অক্রূরদা! শতচ্ছিন্ন পোষাকের ফাঁকে দেখলাম পেট সেঁধিয়ে পিঠের সঙ্গে মিশে গেছে। আমার হাত কেঁপে উঠল। আমি থমকে দাঁড়ালাম। মুহূর্তের জন্য।

অক্রূরদার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি চিনতে পারেননি। তার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গেছে। আমি থেমে যেতে অবাক হয়ে গেলেন। নীরবে সেই ক্ষীণ দৃষ্টিতে খিচুরী ঢালাবার জন্য অনুনয় করছেন।

আমি পক্ষপাতিত্ব করলাম। এক হাতের বদলে দুহাতা ঢেলে দিলাম। তার পেছনে তার বৌ ও মেয়ে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের আর বেশী দিতে পারলাম না। কাঁসী-বাজিয়ে ছেলে তাদের সঙ্গে ছিল না।

খিচুড়ী পেয়ে অক্রূরদা তাড়াহুড়া করে ছুটে গেলেন মাঠের অন্য ধারে। বসেই খেতে শুরু করলেন। এর বেশী আর তখন দেখতে পাইনি।

খিচুড়ী বিলি শেষ করে হাত ধুয়ে ছুটলাম মাঠের অন্য ধারে—যেখানে

অক্রূরদাকে খাওয়ার জন্য বসতে দেখেছিলাম। ইতিমধ্যে ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে।

গিয়ে দেখি অক্রূরদা শুয়ে পড়েছেন। কতদিন অভুক্ত ছিলেন জানিনা। খিচুড়ী ভোজনের পর শুয়ে পড়া বিচিত্র নয়। বৌ ও মেয়ে চুপচাপ আছে। অক্রূরদাকে বিশ্রাম করবার সুযোগ দিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম।

আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এক সময় আমার এক বন্ধু জানাল যে সেদিন একজন খিচুড়ী খেয়ে মরে পড়ে আছে। কোথায় মরেছে জানতে চাইলে বন্ধু হাত উঠিয়ে মাঠের অন্য ধার নির্দেশ করল।

পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে দেখলাম খিচুড়ী খাবার পর মাঠে ঘাসের বিছানায় শুয়ে চিরকালের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছেন অক্রূরদা।

সেদিনও অক্রূরদাকে দুই রূপে দেখেছিলাম। একরূপ খিচুড়ী নেবার সময়, আর অন্য রূপ তার মৃত্যুসজ্জায়।

৺কালীপূজায় ঢাকের বাদ্য শুনলে আমার চোখের উপর অক্রূরদার এই দুই রূপ ভেসে ওঠে।

মলিনা মলিন নয়

কিরণচন্দ্র মৈত্র

প্রেমের সন্ধান করছি ঠিকই, তবে সেটা নিজের জন্যে নয়। জীবনের পঞ্চম মার্গের সামান্য নীচে অবস্থান করছি; প্রেমের জন্যে আমি মোটেই চঞ্চল নই। আমার প্রেম দ্রবীভূত-ঘনীভূত-মন্দীভূত-কেন্দ্রীভূত হয়েছে ওই এক জায়গায়—মিউচুয়্যাল পাকাচুল তোলায় যার একমাত্র বহিঃপ্রকাশ! সমস্যাটা একটু খুলেই বলি।

সম্পাদকের চিঠি পড়েত মাথায় বজ্রাঘাত! নিজেকে তাঁর ভাই সম্বোধন করে—কেন যে ছাই লেখকের খাতায় নাম লিখিয়েছিলাম! সম্পাদকের আব্দার—গল্প চাই—টকটকে তাজা প্রেমের গল্প! পত্রিকার আগামী সংখ্যা 'প্রেমের গল্প সংকলন' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। দশদিনের মধ্যে আমাকে একটা গল্প দিতেই হবে। এখন দিতে হবে বল্লেইত আর দেওয়া যায় না; না সব উজাড় করে দিয়েও কূল পাওয়া যায়? যুগটাই যে দিতে হবে দিতে হবের যুগ! কিন্তু তাঁর সামান্য দাবি আমার কাছে যে কী মারাত্মক ব্যাপার! সেই যে দুষ্টু ছেলেদের উদ্দেশ্যে ব্যাং বলেছিল—বাছারা, তোমাদের কাছে যেটা খেলা আমাদের কাছে সেটা মৃত্যু! আমি এক অকাল-অপক্ক ফোর্থগ্রেড লেখক। সামান্য যা কিছু লিখি সবই প্রায় জীবনের অভিজ্ঞতাজাত। একেবারে সদ্য-কাটা পাঁঠার রক্তের মত তাজা অভিজ্ঞতা। এই হাতে প্রেমের গল্প লেখা কি চারটিখানি কথা? তাও আবার নবীন বা একেবারে ভোরের টাটকা ফুলের মত!

উঠতি বয়সে বার কয়েক প্রেমের চেষ্টা করিনি তা নয়। টোপ ফেলেছিলাম; কিন্তু টোপ গেলাত দূরের কথা কেউ স্পর্শই করল না। যা চেহারা! যিনি বর্তমানে আমার 'বেটার হাফ' তার শুভদৃষ্টি খুব শুভ হয়েছিল বলে মনে হয় না। শুভ দৃষ্টির পর আর একবার দৃষ্টি বিনিময় হলে দেখা যেত তার চোখের জলে বান ডেকেছে।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প ফাঁদলে এ যুগের অনেক রোমিও হয়ত ভয় ও বিরক্তিতে ও লাইনই ছেড়ে ছুড়ে দেবে। প্রেমের খেলা বলতে

ষা ওই রিতুর মায়ের সঙ্গে; তাও বিয়ের পর। বিয়ের পর একদিন আচমকা ধরে চুমো খেতে গিয়ে কি বিপদ—এইসা চিৎকার দিল—ভাগ্যিস ধারে কাছে কেউ ছিল না। একদিন অফিস কামাই করলাম, কিন্তু লজ্জায় সারাটা দিন একবারও কাছেই এল না। সুযোগ মত একবার হাত চেপে ধরলাম—ছি ছি করে উঠল—পূজোর কাপড় ছুঁয়ে দিলে, আবার চান করতে হবে। একবার ঠিক করলাম ওকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে পার্কষ্ট্রীটের চীনা রেস্তোঁরায় খেয়ে বাড়ী ফিরব—শেষ পর্যন্ত যেতে হল কালীঘাটে। সেসব অভিজ্ঞতা বড়ই বেদনাদায়ক। বনগোলাপের মত, গাছের ডগায় একটা ফুল থাকল কি থাকল না, সারাটা দেহই কাঁটায় কাঁটায় জর্জরিত!

হাতের কাছে তারকের কেসটা রেডি ছিল—একেবারে তাজা-নবীন গরম রোমান্টিক প্রেমের গল্প। কিন্তু ওর কেসটা যতদূর শুনেছি সম্প্রতি কেঁচে গেছে—মিলন না হতেই বিয়োগান্ত পরিণতি! তারক আমাদের বাড়ীর চাকর। বছর বাইশ বয়েস। চালু ও চটপটে। লিখতে পড়তে জানে, অর্থাৎ শিক্ষিত। অনেক গুণ আছে ছেলেটার। ও আছে বলে আমরা কোনদিন পাঁউরুটি বা কেরোসিনের অভাব বুঝিনি। বাঁশী বাজাতে পারে, ভালো ফুটবলও খেলতে পারে নাকি। ছুতোর মিস্ত্রির সব কাজ জানে। কিন্তু বাড়ির চাকর কাজেই আত্মপ্রকাশের কোন সুযোগ নেই। আমার সাথে ওর খাতিরটা একটু বেশী। আমি ওকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে থাকি; পুরণো জামা-প্যান্ট দিয়ে ওকে সামান্য কেতাদুরস্ত হবার সুযোগ করে দিয়েছি। তাছাড়া ওর বদ্ধমূল ধারণা, টাকা জমিয়ে ও যখন ছুতোর মিস্ত্রির ব্যবসা করবে আমি ওকে অনেক কাজ জুটিয়ে দেব। সে যাই হোক পাশের বাড়ির ঝি, বিন্দের মা, ভায়া মিডিয়া আমার স্ত্রীর কাছ থেকে তারক সম্পর্কে কিছু মুখরোচক গোপন তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। তারক প্রেমে পড়েছে ও চুটিয়ে প্রেম করছে। নায়িকা, মিত্তিরদের বাড়ির ঝি মলিনা। শক্ত-সোমত্ত মেয়ে; বেশ ডবকা চেহারা।

মিত্তির গিন্নীর সিনেমার বই পাল্টাতে মলিনা প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসে। দু একবার টেরিয়ে দেখিনি বল্লে মিথ্যে বলা হবে! তারক বেটার 'চয়েজ' আছে। তারক মলিনাকে জল পাম্প করে দিচ্ছে ফুটপাতে এ দৃশ্য দু' একবার আমার চোখেও পড়েছে। ওরা নাকি জোট করে একসাথে রেশন তোলে;

লাইনে দাঁড়ায়; দুপুরে পাড়ার পার্কে ফষ্টিনষ্টি করে। সম্প্রতি নাকি ওরা দুজনে 'ববি' দেখেছে! এমন চমৎকার প্লট! কিন্তু গত রাত্রে পরিবারের মুখে শুনলাম সব আপসেট হয়ে গেছে। আমাদের তারকচাঁদ কাজ কাম ছেড়ে সাট্টা খেলা ধরেছে—সে নাকি আওয়ারা হয়ে যাবে! ঘটনার বিবরণ অত্যন্ত করুণ। মিত্তিরের হারামজাদা মার্কা সেজ ছেলেটি, মলিনার পেছনে লেগেছিল। অনেক চেষ্টা করেও মলিনা আত্মরক্ষা করতে পারেনি। ছোরা দেখিয়ে নাকি কাজ হাসিল করেছে। মলিনা অন্তঃস্বত্বা। তারক ঝগড়াঝাটি করে মলিনার সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে। তারক নাকি শাসিয়েছে মলিনা আর ওই শয়তানকে খুন করে জেলে যাবে। সুন্দর একটা প্লটের দফা-রফা!

কলকাতার আকাশে-বাতাসে হাটে-ঘাটে নাকি প্রেম ছড়িয়ে আছে। আমাকে একটা প্লট ধরতেই হবে। অগত্যা অফিসের পর নিয়ম করে আমি ঘুরি ফিরি কলকাতার ঘাটে ঘাটে প্রেমের সন্ধানে। যদি একটা স্ন্যাপ-শট পাওয়া যায়, প্রিন্ট-এন্‌লার্জ করে চালিয়ে দেওয়া যাবে। পাড়ার 'টিনএজারসরা' চুটিয়ে প্রেম করে জেনেও ওদের ধারে কাছে ঘেষলাম না। প্রথমত, চুল সাজ-গোজের যা বহর তাতে বিপদ-সীমা পেরিয়ে খুব কাছে না গেলে বোঝাই দায় কোনটি রোমিও আর কোনটি জুলিয়েট! দ্বিতীয়ত, ওরা আজকাল 'তুই' সম্বোধন করে। কাজেই বোঝা দায়—ভাই-বোন না নায়ক-নায়িকা।

শূন্য মনে বেরিয়ে পড়লাম পাড়ার বাইরে। যেমন প্রতিদিন শূন্য থলে নিয়ে বাজার করতে যাই। প্রায়-দিনের মাছের শূন্য থলের মত শূন্য মনেই ফিরে আসতে হয়।

ডালহৌসির প্রেম আমার মোটেই পছন্দ নয়। এখানে ঘামের কাছে সেন্ট পরাজিত। দু'জন পাশাপাশি চলছেন—হাঁটছেন যেন লেফট-রাইট—একটি বারও ছন্দপতন নেই! কথা হচ্ছে স্বাভাবিক গলায়—অফিস, ইউনিয়ন, অর্ডিন্যান্স, বাজারদর, কিছুতেই চালাতে পারছিনা ইত্যাদি। আর চলতেও যেন পারছেন না—একখানা খালি ট্রাম-বাস চোখে পড়ামাত্র—"ওই আমার গাড়ি এসে গেছে—চলি।" চোখে-মুখে এতটুকু ভাবান্তর নেই। পো-দৌড়; তারপর একলাফ ও একটি সিট দখল—প্রেমের জন্য থেকে বাসে সিট জন্য অনেক বড়!

আমি শ্যামবাজারের 'শনীবাবু' গেলাম একদিন দেশবন্ধু পার্কে। ওমা. এসে দেখছি একদম ফাঁকা! সবুজ ঘাসের সাথে সবুজ প্রাণগুলিও দেখছি অদৃশ্য হয়ে গেছে। একটা কাক কোথা থেকে ছুটে এসে মাথার ওপর কা কা সুরু করল। ও যেন বলতে চায়, প্রেমিকদেরখেয়ে দেয়ে কাজ নেই, সন্ধ্যাবেলা পার্কে বসে—না হল না—শুয়ে প্রিয়ার কোল বালিশে মাথা রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘাস চিবুবে!

ওদের সাথে ট্রাম থেকে নামলাম; বিশ্বরূপা থিয়েটারে ঢুকলাম—আসামী—হাজির! ওদের পেছন পেছন কাউন্টারেও গিয়ে দাঁড়ালাম। ক্লোজ ভিউ থেকে শট্ নেয়া যাবে! কিন্তু কেস্ কেঁচে গেল; পাঁচ টাকার নীচে টিকিট নেই। নায়ক পিছিয়ে গেল। লেখকও। নায়িকা রীতিমত বিরক্ত। শনিবার এ্যাটেম নেব আবার। নায়িকার বোমশেল—"রোজ রোজ ফিরে যেতে পারব না। 'শনিবার' না হলে আমি বিশুদাদের সাথে দেখব—আগে থাকতেই বলে রাখছি।"

—"এখন কী করবে?"

—"চলনা হাঁটতে থাকি যেদিক দুচোখ যায়।"

এ কেমন ধারা প্রেম গো বাবা! ট্যাকসি নয়, রেষ্টুরেণ্ট নয়, এমনকি ফিরে যাবে তবু পাঁচ টাকার টিকিট কাটবে না! ব্যাটা দেখছি কবুতরের কলজে আর ফতুয়ার পকেট স্বর্বস্ব করে প্রেম করতে নেমেছে! নায়িকার জন্যে একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাসে প্রেম-কাব্যের পরিণতি ঘটল।

হায় মোর চির পরিচিত 'কফি-হাউস'; এখানেও দেখছি হাওয়া পাল্টে গেছে! শুধুমাত্র পোষাক-পরিচ্ছদ-চুল-জুলপি নয়, গল্পের ধারাও আমূল পাল্টে গেছে দেখছি! আঁতেলেকচুয়ালদের উচাঙ্গ সঙ্গীতের আসর আজ আধুনিক সঙ্গীতের জলসায় পরিণত হয়েছে! একেবারে বারোয়ারী পুজোমণ্ডপ! একটি জোড়াকেও আলাদা করতে পারলাম না। পাশের টেবিলের নায়িকাটি তার পাশের জনকেও চড়-চাপড় মারছে; আবার সামনের জনকেও—ভাবটা যেন 'তোদের দু'জনকেই আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়ে ছাড়ব!' কোথায় সেই শান্ত, লাজুক লাজুক ভাব!

চৌরঙ্গীর প্রেম বড্ড চলমান—দামী মুভি ক্যামেরা ছাড়া ফটো তোলা

মুস্কিল। অনেক কালের পরিচিত রেঁস্তোরায় ঢুকে পড়লাম। এক কাপ চা ও একটি চার্মিনার-এর বেশী মূলধন নিয়োগ করতে হবে না। কেবিনের চেষ্টা না করে ওরা পাঁচজনের মাঝখানে একটা টেবিল দখল করল। আমিও ওদের শ্রুতির মধ্যে না পারলেও দৃষ্টির মধ্যে একটা চেয়ার দখল করলাম। চপ-কাটলেট-ফ্রাই-মোগলাই থাকতে শুকনো দু'টুকরো কেক্ আর চা! একেবারে বে-রসিক! কেক! কেক'-এর সাইজও ঠিক পূর্ণিমার পর ক্রমশঃচাঁদের যা হাল হয়। এরপর নায়ক আর কিছু অফার করে না! দুজনেই দেখছি টাকা বার করছে। একটা নাটকীয় মুহূর্তের জন্যে আমি তৈরি হই—আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান—টাসেল এ কে জয়ী হয়, অর্থাৎ দাম মিটিয়ে সন্ধ্যাটা কে দখল করে ব্যাপারটা আমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝলেও, ওদের মধ্যে বোঝাবুঝি ঠিকই ছিল—ছিজ হিজ হুজ-হুজ! ডিসের পুরো পয়সা এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে গোটা টাকা বখশিস দেয়া রীতি, যাতে বেয়ারা পাশের মেম সাহেবকে একটা লম্বা-চওড়া সেলাম দেয়। আমার কপালের মত বেয়ারার কপালও আজ মন্দ; ওরা ডিসটা চেঁছে-পুঁছে নিয়ে গেল।

'ভিক্টোরিয়া'র প্রেমের প্রতি আমার কোনদিনই তেমন আগ্রহ বা কৌতূহল নেই। ওখানে 'নন্-বেঙ্গলীদের' আড্ডা। এদের প্রেমে রোমান্সের বড়ই ঘাটতি। নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক যেন খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। আসা অবধি খেয়েই চলেছে—চা-কেক্-চপ-বাদাম-ফুচকা-তেলমুড়ি-ভেলপুড়ি; খাওয়ার শেষ নেই! পয়সা থাকলেই খাওয়ান যায়। কিন্তু শুধুমাত্র খাইয়ে বা খেয়ে প্রেমের সাগর পাড়ি···এমন কথাত শুনিনি কস্মিনকালে!

কলকাতা শহরকে দু'অঞ্চলে ভাগ করলে দেখা যায় উত্তর কলকাতা আদি অকৃত্রিম বা ক্ল্যাসিক; দক্ষিণ কলকাতা অপেক্ষাকৃত নবীন যৌবনা; কাজেই রোমান্টিক। দক্ষিণ কলকাতার ঝিরঝিরে আবহাওয়ায় রোমান্সের মাত্রা কিঞ্চিত্তাধিক। একমাত্র লেকই আমাকে উদ্ধার করতে পারে। লেক'এর সবুজ গাছপালা, সবুজ ঘাস, সবুজ টলটলে জল—সবুজ প্রাণের জন্যে প্রকৃতি স্বয়ং একটা পটভূমি রচনা করে রেখেছে। সুন্দরবনে শিকার পাব না, পুরীর মন্দিরে পাণ্ডা পাবনা, 'লেক'-এ প্রেমের দৃশ্য পাবনা ইত্যাদি উদ্ভট চিন্তা আমার ধাতে সহ্য হয় না। অতএব 'লেক'-এ এক সন্ধ্যা না কাটিয়ে আমার প্রেম-পরিক্রমার ইতি হতেই পারে না। লেক-এ গেলাম; প্রেমও পেলাম। নিরাপদ

দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পেছনের বেঞ্চি:তে মড়া মানুষের মত বসে রইলাম। বনলতা সেনের মতই নায়িকা আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল—বুঝিয়ে দিল ধারে কাছে কেউ থাকলে তারই অসুবিধা হবে, ওদের কিছু যায় আসে না।

ওমা নায়িকা দেখছি সিগারেট ধরায়—বোধহয় নায়ককে ধরিয়ে দিচ্ছে—বেশ বেশ! নায়কও যে আর একটা ধরাল! এবার সিগারেট বদল—বদলের আগে দুজনেই হাতের সিগারেটকে একটা মোটামুটি লম্বা-চওড়া চুমো খেল! এর চাইতে ওরা সত্যিকারের…ব্যাপারটা কম দৃষ্টিকটু হ'ত।

মনে মনে আওড়াই—আমি খুব বিপদগ্রস্ত—দিদি-ভাই বেশ রসিয়ে রসিয়ে একটু প্রেম কর—আমি তোমাদের কোন অসুবিধা সৃষ্টি করব না। আমাকে একটু সুযোগ দাও—শিল্পী মনের মাধুরী দিয়ে তোমাদের নৈসর্গিক প্রেমকে রোমান্সের বাগানের লাল সুরকির পথ দিয়ে একেবারে ঐশ্বরিক স্তরে পৌঁছে দেব—ধন্য ধন্য হয়ে উঠবে তোমাদের জীবন-যৌবন-প্রেম-ভালবাসা। ওরা সম্ভবত আমার মনের কথা শুনতে পেয়ে ওদের মনের দরজা খুলে ধরল। এরপর আমি যে ক্লোজ-শট নিলাম তার নেগেটিভখানা তুলে ধরছি। পাঁচজনের মতামত না নিয়ে প্রিন্ট বা এনলার্জ করবার রিকস নেব না।

—তোর ওই লম্বা নখটা দেখলে ভয় হয়; ওটা কাটিসনা কেন?

—ওটা'ত তোর আচমকা আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার অস্ত্র।

—আমি আক্রমণ করি তোকে, আর তুই বুঝি ধোয়া তুলসী।

—আমার বয়েই গেছে, যা দুর্গন্ধ তোর গায়ে, পাশে বসতেও ঘেন্না করে।

—বিয়ের পর দুর্গন্ধেই মজতে হবে!

—বিয়ের পর! হোয়াট ডু ইউ মীন!

—কেন? বিয়ের পর মানে বিয়ের পর—মানে আমরা দুজনে যখন বিয়ে…

—দেখ জন্তু…

—আমার নাম জয়ন্ত

—'জন্তু' আমার দেয়া আদরের নাম! আমি এই নামেই ডাকব।

—কেন, আমি কি তোর পোষমানা ঝুমু সোনা?

—তা হলেও বর্তে যেতিস; তুই তারও অযোগ্য। আবার বর হবার সখ! তোকে না হাজার বার বলেছি নিজেকে সিনেমার হিরো ভাবিস না—ওসব ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না। তোকে আমি বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখেরে?

—বারে, দুঃখে করতে যাবি কেন! আনন্দে-সুখে আমরা বিয়ে করে নীড় বাঁধব—আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি—প্রেমের পরিণতি বা সার্থকতা বিয়েতে। (নায়িকার একখানা হাত চেপে ধরল)

—ফের ওই সিনেমা আর বস্তাপচা উপন্যাসের প্যানপ্যানানি সুরু করলি। ইউ আর জাস্ট মাই বয়-ফ্রেণ্ড। তোর সাথে 'লব' করেছি বলেই তোকে বিয়ে করতে হবে এমন দাসখত লিখে দেইনি। ওসব বিয়ে-টিয়ে চিন্তা ছেড়েদে বলছি। তোকেত বলেইছি, প্রেমের কোন ভবিষ্যৎ নেই, সে বর্তমানে কেন্দ্রীভূত, বর্তমানেই দ্রবীভূত; আর বর্তমানটা কতটা আকর্ষণীয় তা নির্ভর করে আণ্ডারষ্টাণ্ডিং-এর ওপর। (নায়িকা হাত ছাড়িয়ে সিগারেট ধরায়)

—দেখ রত্না তোর এই উড়াপাড়া কথা আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমরা বিয়ে করব না'ত সারাজীবন এভাবে ভেসে বেড়াব?

—ভেসে বেড়াব না। আবার তোর মত একটা কলাগাছের ভেলার ওপর নির্ভর করে'ত আর জীবন-সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যায় না—একটা মজবুত জাহাজে চাপতে হবে বুঝলি হাঁদারাম! (নায়ককে একটা ঠ্যালা মারল।)

—আমাকে তুই কলাগাছের ভেলার সাথে তুলনা করতে পারলি?

—এখন ত তুই ভেলাও নোস। তুই ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আদৌ চান্স পাবি কিনা; পেলেও পাশ করবি কিনা; পাশ করলেও চাকরি পাবি কিনা, কিছুই ঠিক নেই। দেখা গেল বেকার ইঞ্জিনিয়ারের খাতায় নাম লিখিয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, কিংবা ব্যাঙ্কের টাকায় স্কুটার রিকসা চালাচ্ছিস; কিংবা 'আত্মনির্ভরশীল' বেকার ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যাকার্ড টাঙিয়ে ফুটপাতে সায়া 'ব্রা'উজের দোকান সাজিয়ে বসেছিস! চাঁদুর আবার বিয়ে করবার সাধ! আধ ডজন ভাই বোনকে মানুষ করবি না নিজে মানুষ হবি। রাগ করিসনা, তোকে আমি বর হিসাবে ভাবতেই পারিনা।

—তুই বা কি এমন একটা রাজকন্যা…?

—রাজকন্যা নয় বলেই'ত একটা শক্ত খুঁটি ধরতে হবে। রাজকন্যা হলে তুই-ত-তুই, ওই বাদামওয়ালার গলায় মালা ঝুলিয়ে দিতাম। অর্ধেক রাজত্ব যখন আঁচলের খুটোয় বাঁধা তখন আর ভয় কি। তোকে ক-অ-বে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে গিয়ে পুষতাম। (দুই হাত দিয়ে নায়কের গাল টিপে দিল)

—বিয়ের পরত আমাকে চিনতেই পারবি না—তাই না?

—চিনতে না পারার কি আছে। আমার বয়ের সাথে সাজরে তোর আলাপ করিয়ে দেব—আমার এক সময়ের 'বয়-ফ্রেণ্ড'; বিয়ে বিয়ে করে আমার বড্ড বোরতা করত। জস্ত—ইউ আর রিয়েলি এ বোর। নে এখন ওঠ, আমার একটু তাড়া আছে।

—আচ্ছা রত্না, তোর যদি সেরকম বর না জোটে ?

—বয়েই গেল; বিয়ে করব না; বিয়ে না করেও দিব্যি কাটান যায়; একমাত্র জ্যান্ত ও আইনসিদ্ধ সন্তান ছাড়া কোন কিছুই অভাব নেই। নে এখন চটপট উঠে পড়। (নায়িকা সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ায় ও শাড়ি ঠিক করে)

—শফরিতে কফি খাওয়াবি বলেছিলি ? খাওয়াবি না ?

—সেই জন্তেই'ত বলছি তাড়াতাড়ি উঠে পড়, নইলে আবার দেরি হয়ে যাবে। তবে কফি ছাড়া আজ আর কিছু খাওয়াতে পারব না চাঁদু।

লেখক, তুমিও উঠে পড়। তোমার ক্যামেরায় অনেকটা শট্ নিয়েছ। কিন্তু আধুনিক প্রেমের গল্প নৈব নৈবচ—তোমার ক্ষমতার বাইরে। জেনারেশন গ্যাপ। তোমার উপলব্ধিতে কড়া পড়ে গেছে। তুমি অনেক পিছিয়ে আছ। প্রেম চিরন্তন, অবিনশ্বর; কিন্তু যুগে যুগে তার রূপ পাল্টায়—নিজের চোখেই দেখলে—এ প্রেম সে প্রেম নয়, সে প্রেম হয়েছে বাসি। প্রেমের দেবতা পরাভূত নয়, পরাভূত তুমি শর্মা, আর তোমার কলম। তোমার জীবনবোধ হেজে-মজে পচে গেছে। সামান্য বক্স ক্যামেরায় চলমান জীবনের ছবি তোলার স্পর্ধা করলেই কি ছবি তোলা যায়! অতএব বৎস, সময় থাকতেই সম্পাদকের শ্রীচরণে 'স্যারেণ্ডার' কর।

গল্প দিতে না পারলেও কাউটা দিতে আপত্তি কোথায়! রোজকার মত বাড়ি ফিরে জামা-জুতো খুলে, এক গ্লাস জল-পান করে বিড়ি ধরাতে গিয়ে বিড়ির কৌটায় একখানা চিরকুট পাওয়া গেল। ওই বিড়ির কৌটার তত্ত্বাবধানের দায় দায়িত্ব শ্রীমান তারকচন্দ্রের—'ষ্টক-লেভেল' যেন মারাত্মক ভাবে কমে না যায়!

চিরকুটখানা লিখেছেন স্বয়ং তারকচন্দ্র!

"শ্রীশ্রীচরণেষু দাদাবাবু, মলিনার ভারি বিপদ। আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই। মলিনা আমাকে বড়ই ভালবাসে। মলিনাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। আজ ওকে আমি কালীঘাটে বিয়ে করেছি। আপনি আমার শতকোটি প্রণাম নেবেন—ইতি—আপনাদের তারক।"